হাতে খড়ি

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৫৪
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২
মুদ্রাকর—শশধর চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস লিঃ
২৫, ডি, এল, রায় ষ্ট্রীট
প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স
তিন টাকা

গল্প

হাতে খড়ি

মিটুর হাতে-খড়ি হইল।

অনুষ্ঠানটি তেমন বড় কিছু না হোক, মিটুর কাছে কিন্তু মস্ত বড় একটা মুক্তির আকারে আসিয়াছে। কারণটা বলি।

ছেলেটির লেখাপড়ার দিকে খুব ঝোঁক, আরও বেশি বাড়িয়াছে—এই বৎসর খানেক হইতে। লেখাপড়াটা হয়তো এমনই খুব লোভনীয় জিনিস নয় একটা—বেত আছে, কানমলা আছে ; যেদিন মামার বাড়ি থেকে সঙ্গীরা আসে, খেলা বেশ জমিয়া ওঠে, সেদিনও স্কুলে যাওয়া আছে—দেখে তো ছোড়দার অবস্থা ; তবুও একটা গুণ আছে, বেশ যেন বড় করিয়া দেয় বই-স্লেটে। দাদাকে দেখে তো, যখন-তখন যাহা ইচ্ছা বানান করিতেছে ; যাহা খুশি লিখিতেছে ; খাইয়া-দাইয়া হাফ-শার্টটা গায়ে দিল, ব্যাগে বই-স্লেট পুরিয়া কাঁধে ঝুলাইয়া লইল, গট গট করিয়া স্কুলে চলিয়া গেল। অতটা না হোক, তবু প্রায় বাবার কোট-প্যাণ্ট পরিয়া মুখে পান গুঁজিতে গুঁজিতে আফিসে যাওয়ার মতো একটা কাণ্ড ; যতক্ষণ না মোড় ঘুরিয়া স্কুলের পথে চলিয়া যায়, মিটু চারিটি আঙুল মুখে দিয়া দোরের কাছটিতে দাঁড়াইয়া দেখে।… কী ভয়ানক যে ছোট বোধ হয় নিজেকে !…

—আর তাড়াতাড়ি বড় হওয়া যে দরকারও হইয়া পড়িয়াছে এদিকে। খোকা ছিল না, এক রকম চলিয়া যাইতেছিল। এখন

খোকা আসিয়াছে, হামাগুড়ি পর্যন্ত দিতে শিখিয়া গেল, মা বলিতেছে এইবার কথা কহিতে শিখিয়াই সব্বার আগে তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকিবে।...তখন!

মিটু যে একেবারে বসিয়া আছে এমন নয়। আরম্ভ করিয়াই দিয়াছিল। দাদার কাছে শিখিয়া শিখিয়া অ—আ—ক—খর সমস্তটা জানে। ই পর্যন্ত লিখিতে পারে, একে চন্দ্রর সমস্তটা পারে গুণিতে। এতদিন দাদার সমান হইয়া যাইতই, মা-ই তো বারণ করিয়া সব মাটি করিয়া দিল। সেদিনকার কথাটা বেশ মনে আছে মিটুর। দাদার লেখার উপর দাগা বুলাইয়া বুলাইয়া শুঁড়ওলা চিংড়ি মাছের মতো ই-টাকে শিখিয়া ফেলিয়াছে। দাদা দেখিয়া বলিল, "উস্! তুই দেখছি আমার চেয়েও ভালো লিখবি, মিটু।"

এতো ভালো লাগিল মিটুর। জিজ্ঞাসা করিল, "বাবার চেয়ে?"

"বাবা কি আমার চেয়ে ভালো লেখেন নাকি?"

দাদা বড়দের মতো একটা চোখ একটু ছোট করিয়া মাথাটা একটু দুলাইয়া দিল, তাহার পর কথাটা কাহাকেও বলিতে বারণ করিয়া স্কুলে চলিয়া গেল। মা খুব ব্যস্ত; একবার মনে হইল বলি, আবার ভাবিল না, এখন না। নিচে নামিয়া আসিয়া পেন্সিল দিয়া পড়ার ঘরের দেয়ালে অনেকগুলা ই লিখিল; তাহার পর বাবা যখন খাইয়া আফিসে চলিয়া গেছে, হাতের মুঠায় একটা ছোট কয়লা লইয়া আবার উপরে রান্নাঘরে উঠিয়া গেল। মা খাইতে বসিয়াছে বাবার পাতে, মিটু গিয়া বলিল, "একটা কি ভয়ানক জিনিস জানি দেখবে মা?"

মা বলিল, "কি?"

মিটু বলিল, "তা হলে চোখ বোজ কিন্তু; যতক্ষণ না ওয়ান-টু-ত্রি বলব ততক্ষণ খুলতে পারবে না। খুলবে না তো?"

মা বলিল, "না"।

মিটু বলিল, "না, তুমি খুলবে।"

তাহার পর মিটুর মনে পড়িয়া গেল ঠাকুরমা একদিন যা বলিয়াছিলেন। বলিল, "হ্যাঁ, তুমি তো মিথ্যে কথা বলবে না, না মা?—খেতে বসেছ যে।"

মা যে এত সোজা কথাটায় কেন একটু চোখ রাঙাইয়া হাসিল, মিটু বুঝিতে পারে না।

তারপর মা চোখ বুজিলে মিটু খুব আস্তে আস্তে দেয়ালে ই-টা লিখিল। তাহার পর বলিল, "ওয়ান-টু-থ্রি, চোখ খোল!"

মা দেখিয়াই কিন্তু রাগিয়া উঠিয়া চোখ বড় বড় করিয়া বলিল, "মোছ্, মোছ্, শীগ্‌গির মোছ্—কে শেখালে তোকে? মা সরস্বতীর সামনে এখনও হাতে-খড়ি হয়নি..."

মা ঠাকুরদের বড্ড ভয় করে। নিজে উঠিয়া মা সরস্বতী টের পাইবার আগেই ই-টা মুছিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আর কিছু শিখেছিস? আরও কোথাও লিখেছিস?"

বেশ মনে পড়ে—মিটুর কান্না পাইতে লাগিল। অনেক কষ্টে বলিল, "না।"

"আর কুলও এখনও খাস নি তো?" মিটু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না, খায় নাই।

মা আবার পাতে বসিয়া বলিল, "খবরদার খবরদার, আর অ-আ ও মুখে এনো না। শিখতে যাও নি তো? হাতে-খড়ি না দিয়ে—মা সরস্বতীকে প্রণাম না করে পড়লে, কি লিখলে, কি কুল খেলে, মা ভয়ানক চটে যান, একেবারে বিদ্যে দেন না। খবরদার।"

সেই থেকে কি করিয়া কাটিতেছিল মিটুর! যাহাতে মা সরস্বতী টের না পান সেই জন্য অ-আ-ক-খ গুলোকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া পেটের একেবারে খুব ভিতরে করিয়া দিয়াছিল। একবারও লেখে নাই। মিটু টের পাইত সেগুলো ঠিক গলার নিচে পর্যন্ত আসিয়া ঠেলাঠেলি করিত, শুড়শুড়ি দিত, কিন্তু মিটু একবারও তাহাদের বাহির হইয়া মুখে আসিতে দেয় নাই।

তাহার পর সেই আজ হাতে-খড়ি হইয়া গেল, সবগুলো যেন হুড় হুড় করিয়া বাহির হইয়া আসিল; একদিন দাদাকে স্কুল থেকে আনিবার জন্য চাকরের সঙ্গে গিয়া মিটু যেমন দেখিয়াছিল, ঘণ্টা বাজার সঙ্গে ছেলেরা হুড় হুড় করিয়া বাহির হইয়া আসিল, সেই রকম।

আজ সকাল থেকে বেশ ভালো লাগিতেছে মিটুর—যখন ইচ্ছা অ-আ বলিতেছে; শুধু শুধু আবার প্রথম ভাগ খুলিয়াও, এই এত-দিনের অ-আ-ক-খ বাহির হইয়া আসিয়া পেটটাকে হালকা করিয়া দিতেছে। লিখিতেছেও; ই শেখার পর দুটো রাঁধা চিংড়ির মতো ঈ-টার ওপর বড় লোভ ছিল, খুব দাগিয়াছে। আর একটু, তাহার পরই শিখিয়া যাইবে। এইবার শিখুক না খোকা দাদা বলিতে—যত পারে।

আজ সকাল থেকে মিটুর মনে দুটি চিন্তার ধারা বহিয়া চলিয়াছে—এক এই, আর এক মা সরস্বতীকে লইয়া। কাল যখন ঠাকুরকে আনিয়া ঘরে রাখা হইল তখন থেকেই মিটুর মনটা যেন কেমন হইয়া-ছিল—কতকটা ভয়ও আছে, আবার খানিকটা আহ্লাদও—মিটু ঠিক বুঝিতে পারে না। আহ্লাদ এই জন্য যে, ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিলে একেবারেই ভয় হয় না,—বেশ কেমন মা-মা ভাবটা, কোলে

শুইয়া খোকা খেলা করিলে মায়ের মুখে যেমন হাসি থাকে, বেশ সেই রকম হাসি—চাহিয়া দেখিতে বেশ ভালো লাগে। কিন্তু সেই যে হাতে-খড়ির আগে অ-আ শিখিয়াছিল, মিটু 'ই' পর্যন্ত লিখিত, সে কথাটা জানেন নাকি ঠাকুর? মিটু চাহিয়া দেখে—হাসি একটুও বদলাইয়া রাগ আসিল কিনা…বেশিক্ষণ চাহিয়া থাকিতে সাহস হয় না।

আজ সকাল থেকে কিন্তু ভয় একেবারেই গিয়া ভালোই লাগিতেছে মিটুর। কেহ নৈবিদ্যি সাজাইতেছে, কেহ ফুল-চন্দনের ব্যবস্থা করিতেছে, কেহ দোয়াত, কলম, বই সাজাইতেছে—আসা-যাওয়া, কাজের ফরমাইস—সকাল থেকে যেন ঠাকুরের চারিদিকে ভিড় পড়িয়া গেছে। মিটু আড়ে চাহিয়া যতবারই মা সরস্বতীর মুখের পানে চাহিতেছে, ততই যেন মনে হইতেছে তিনি হাতে-খড়ির আগেকার কথাটা ভুলিয়াই গেছেন। সেদিন মামার বাড়ি থেকে সবাই আসিয়া পড়িতে, তাঁদের চা খাবার দিতে, তাঁদের সঙ্গে গল্পগুজব করিতে মা যেমন মিটুর রাস্তায় যাওয়ার কথাটা বাবাকে বলিতে ভুলিয়া গেল না? —অনেকটা সেইরকম। তাহার পর পূজা হইল—আরও গোলমাল; তাহার পরই সেজকাকার কোলে বসিয়া হাতে খড়ি…মিটু একবার চোখ তুলিয়া দেখিল—কৈ একটুও তো ঠাকুরের সেই আগের কথা মনে নাই…খালিই তো হাসি—আরও বেশি করিয়া যেন…এমন চমৎকার লাগিতেছিল মিটুর ঠাকুরকে! যখন সেজকাকা বলিতে ঠাকুরকে মিটু বলিল, "খুব বিদ্যে দাও মা",—তখন তো আরও হাসি ঠাকুরের মুখে—সে সব কবেকার পুরনো কথা ভুলিয়া গেছেন বলিয়াই তো?

হাতে-খড়ির পর লেখাপড়ায় প্রচুর মুক্তির মধ্যে মিটুর মনে সম্পূর্ণ একটা অন্যধরণের ভাব ধীরে ধীরে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। ভয়

তো একেবারেই নাই, সকালের দিকের সেই যে নির্মল আনন্দটি, তাহারই পাশে পাশে একটা অদ্ভুত ধরণের কৌতূহল জাগিয়াছে মনে। —ঠাকুরটি কে?—কোথায় বাড়ি? কি করেন?...পৃথিবীতে যত্তো সবাইকে উনিই হাতে-খড়ির পর অ-আ-ক-খ দিয়া বেড়ান? উঃ, কতো আছে!—আরও কত বিদ্যে—দাদাদের বইয়ে, মামা, কাকাদের বইয়ে যত্তো সব আছে।...পৃথিবীর যত্তো সব টাকা যেমন মিটুর দেশের মহারাজের, পৃথিবীর যত্তো সব বিদ্যে তেমনই শুধু মা-সরস্বতীর নাকি? বাবা!...কে তাহা হইলে ওঁর হাতে-খড়ি দিয়াছিল?

প্রশ্নের বোঝা ক্রমেই দুর্বহ হইয়া পড়ে মিটুর, মায়ের কাছে উপস্থিত হয়। প্রথমভাগ আর স্লেট আজ একরকম নিত্যসঙ্গী, হাতেই থাকে।

মা ঝিনুকে করিয়া খোকাকে দুধ খাওয়াইতেছে, মিটু গিয়া পাশে বসে, প্রথম ভাগ খুলিয়া অ-আ'-র অর্ধেকটা পড়িয়া যায়, তাহার পর প্রশ্ন করে, "মা, খোকার কবে কথা ফুটবে মনে হচ্চে?"

ওর কথাগুলো এইরকমই একটু পাকা গোছের, মা হাসিয়া প্রশ্ন করে, "কেন বল্ তো? তাড়াতাড়িটা কিসের?"

"হাতে-খড়ি হয়ে গেল, এবার 'দাদা' বলুক না কত বলবে।"

ঐটুকু ভূমিকা করিয়াই যে যে প্রশ্নের জন্য বিশেষ করিয়া আসা সেগুলো আনিয়া ফেলে, "মা-সরস্বতী কোন্ ঠাকুরের কে হন মা?... আচ্ছা মা, মা-সরস্বতীর কাছে অনেক বিদ্যে আছে?"

"হ্যাঁ, আছে বৈকি। তুমি খুব মন দিয়ে পড়ো, ভক্তি করো, তোমাকেও..."

"কত বিদ্যে আছে—আকাশের মতন?"

"আকাশেও আঁটে না।"

"উরে ব্বাপ!"—বলিয়া পরিমাণটার একটা স্পষ্ট ধারণা করিবার জন্য একটু চুপ করিয়া থাকে, তাহার পর প্রশ্ন করে "কে হাতে-খড়ি দিয়েছিল মা, মা-সরস্বতীকে?"

"ওঁর আর কে হাতে-খড়ি দেবে বাবা? ওঁর হাতে-খড়ি দেবার মতো কি কেউ আছে সংসারে?"

মিটুর মাথায় ঢোকে না কথাটা, একটু বুঝিবার চেষ্টা করিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করে, "কেন?…তাহলে কি করে বিদ্যে হ'ল?"

খোকা শেষের দুধটুকু খাইতে প্রবল আপত্তি করিতেছে, তাহার উপর এ ছেলের এমন প্যাঁচাল প্রশ্নে মা একটু বিব্রত হইয়াই বলে, "হবে না? তুই একটু চুপ কর্ দিকিন। এটা আবার কোনমতে দুধ খেতে চায় না।"

মিটু একটু অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া থাকিয়া প্রথমভাগে মনোনিবেশ করে। কিন্তু মন একেবারেই সরস্বতীর সমস্যা লইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে টানিয়া রাখা যায় না। গোটাচারেক অক্ষর পড়িয়া বইটা দু'হাতে একটু একটু লুফিতে লুফিতে খোকার দিকে চাহিয়া লইয়া বলে, "কী দুষ্টু খোকাটা! দুধ না খেলে হব না ওর দাদা, অ্যাঁ মা?…"

শেষ হইয়াছে দুধ খাওয়া খোকার, মায়ের সঙ্গে সন্ধি হইয়াছে। মা খোকার পানে চাহিয়া হাসিয়া বলে, "আহা, হোয়ো; এবার খোকা হয়েছে লক্ষ্মী!…বই লুফতে নেই।"

"বই তো ঠাকুর, না মা?"—কপালে দুই হাতে চাপিয়া খুব ভক্তিভরে প্রণাম করে মিটু। তাহার পর বলে, "সরস্বতী ঠাকুর বই-ঠাকুরকে পড়েন, মা?"

ভাষার বাঁধুনি দেখিয়া মায়ের হাসি পায়, বলে, "প'ড়েন না।"

"কেন মা?"

খোকা থেকে ফুরসৎ পাইয়া এবার আর মার ধমক দেওয়ার দরকার হয় না, ছেলের বুদ্ধি লইয়া একটু খেলা করিবারও ইচ্ছা করে। প্রশ্ন করে, "তুই-ই বল্ না। হাতে-খড়ি হয়েছে, পড়তে শিখেছিস, বুদ্ধি তো হয়েছে।"

মিটু একটু ভাবে, তাহার পর হঠাৎ মায়ের উত্তরের মধ্যে থেকেই তাহার উত্তরটা জোগাইয়া যায়। বলে, "বলব?—বলব?—হাতে-খড়ি হয়নি যে সরস্বতী ঠাকুরের।"

মা একটু হাসিয়া প্রশংসার দৃষ্টিতে চায়, বলে, "ঐ দেখ্, বুঝেছিস তো এবার?"

মিটু মাথা দুলাইয়া স্বীকার করে—বুঝিয়াছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সমস্যাটি আরও জটিল হইয়া ওঠে। মা মাঝে মাঝে চিন্তান্বিত মুখটির পানে আড়ে চাহিয়া দেখে। ধাঁধায় পড়িয়াছে ছেলে, আবার কি বলে তাহারই প্রতীক্ষা করিতে থাকে। মিটুর হাতে-খড়ি হইয়াছে, বুদ্ধি হইয়াছে, প্রাণপণে চেষ্টা করে অন্তরের সমস্যাটা মিটাইতে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন হদিস না পাইয়া করিতেই হয় আবার প্রশ্ন, "কেন হয়নি হাতে-খড়ি, মা?"

মা ছেলেকে আর দুর্ভাবনায় ফেলিয়া রাখিতে চায় না, ব্যাপারটা পরিস্কার করিয়া দেয়। বলে—সে সব বড় দুঃখের কথা,—কে দিবে হাতে-খড়ি? বাবা মহাদেব ভোলানাথ, অষ্টপ্রহর ভূত-প্রেত লইয়াই ব্যস্ত, তা থেকেও যে সময়টা বাঁচে ভিক্ষা করিতেই কাটিয়া যায়—ছেলেমেয়েদের মধ্যে কে খাইল না খাইল, সে খোঁজই রাখেন না—হাতে-খড়ি দেওয়া তো দূরের কথা। ছেলেমেয়েরাও সব তেমনি, নিজের খেয়াল-খুশি লইয়াই থাকেন—কষ্ট শুধু মায়ের, একলা মানুষ, হেঁসেল দেখেন কি ভাঁড়ার দেখেন...

মহাদেবকে মিটু চেনে কিছু কিছু, তবে তাঁহার সংসারটা যে এমন, সে খবরটা রাখে না ; এমন গৃহস্থালীর কর্ত্রীর প্রতি মনটা বেদনায় ভরিয়া আসে, প্রশ্ন করে, "কে মা ওঁদের মা ?"

"অন্নপূর্ণা।"

মিটু একটু অন্যমনস্ক হইয়া যায়। বেশ নামটি—এত নরম যে শুনিলে কেমন একটা মায়া হয়। আহা, মহাদেব ঐ রকম, ছেলে-মেয়েরা ঐ রকম—একলা মানুষ...

মিটু চুপ করিয়া ভাবে। ছেলে দেব-তত্ত্ব লইয়া মুস্কিলে পড়িয়াছে ; মা আড়ে চাহিয়া চাহিয়া দেখে, মুখে একটা সূক্ষ্ম হাসি লাগিয়া থাকে। এর তুলনায় দুর্গাঠাকুর বেশ জমজমে, সেই জন্যই বোধ হয় মনে পড়িয়া যায় মিটুর। প্রশ্ন করে, "অন্নপূর্ণা মা-দুগ্‌গার কে হন, মা ?"

—বোধ হয় ভাবে, অমন একজন জমকাল ঠাকুরের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকিলে অন্নপূর্ণার কপালটা কোন সময় ফিরিলেও ফিরিতে পারে।

মা বলে, "কে আর হবেন রে বোকা ছেলে ?—অন্নপূর্ণাই তো মা দুর্গা। তিনদিনের জন্যে বাপের বাড়ি আসেন—রাঁধতে হয় না, বাড়তে হয় না—কিছুর জন্যে ভাবতে হয় না—তুই দেখিস নি এবারে মা দুর্গার মূর্তি ? দু'পাশে লক্ষ্মী আর সরস্বতী দুই মেয়ে, তারপর কার্তিক আর গণেশ..."

চিন্তা অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছে। বাধা দিয়া মিটু বলে, "কোন্ সরস্বতী ?"

"ক'জন আবার সরস্বতী আছে ?...আমার কটা মিটু আছে ?—একটাই তো ?...নে, এবার হাঁটু ছেড়ে ওঠ্...খোকাটা ঘুমিয়েছে, শুইয়ে দিইগে।"

মিটুর অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ হইতেছে। শুধু আশ্চর্যই নয়, কেমন মনমরা করিয়া দিয়াছে আজকের ব্যাপারগুলা। সব চেয়ে মুস্কিল হইয়াছে—মা দুর্গাই যে অন্নপূর্ণা, মনকে এটা ও কোনমতেই স্বীকার করাইতে পারিতেছে না। মা দুর্গাকে বেশ মনে পড়িতেছে মিটুর—এবারে পাশের বাড়িতেই দেখিয়াছিল—সিংহের ওপর দাঁড়াইয়া—সিংহ একটা সবুজ রাক্ষসকে কামড়াইয়া ধরিয়াছে—অনেক হাত মা দুর্গার—আর, বেশ মনে পড়ে, মুখটা এমন যে তাহাতে যে কখন রাঁধিবার ভাবনা ভাবিতে হয়—বিশ্বাস করিতেই পারে না মিটু।··· আর পাশে বুঝি এই—সরস্বতীই?—মিটুর এখন মনে পড়িতেছে বটে ঠিক এই রকম শাদা একজন ঠাকুর, ছবিদিদির মতো হাতে এই রকম বাজনা—তবে, এরকম বসিয়া নয় তো, দাঁড়াইয়া আছেন। দাঁড়ানো ঠাকুরকে বসা ঠাকুরের সঙ্গে এক করিয়া লইতে তত বাধে না মিটুর, আর সরস্বতী ঠাকুর যে আসলে নিজেই একজন মেয়ে—এই যেমন ছবিদিদি—এটাও মিটুর মন অল্প আয়াসেই মানিয়া লয়—অতবড় যখন মা, তখন মেয়েই বৈকি···কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে অন্নপূর্ণাকে লইয়া; মা দুর্গার সঙ্গে এক করিয়া কোনমতেই দেখিতে পারিতেছে না। মনটা যেন ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে।

মা দুর্গা অন্নপূর্ণা না হোন, সরস্বতীশুদ্ধ ছেলেমেয়েগুলি যে সব অন্নপূর্ণারই এটা খুব সহজেই মিটুর মন মানিয়া লইয়াছে এবং মানিয়া লইয়া একটি করুণ সংসারচিত্র রঙে রেখায় পূর্ণ করিয়া লইয়াছে।

বড়ই কষ্টে আছে মিটু। সকালে সরস্বতী লইয়া যে ভাবনাগুলা জড়ো হইয়াছিল, এখন আর সেগুলা মোটেই নাই, এখন মিটুর মনটা অন্নপূর্ণাকে লইয়া পড়িয়াছে। আহা একলা মানুষ—মহাদেব ঐ রকম,

ছেলেমেয়েরা এইরকম—বিশেষ করিয়া এই মেয়েটি,—একে অবাধ্য, তায় কানের কাছে ঐ বাজনা বাজানো—সে যে কি জ্বালাতন, দেখিয়াছে তো ছবিদিদি যখন তাহার সেতার লইয়া বসে।

মিটু প্রথমভাগে মন বসাইতে পারে না, লেখার তো কথাই নাই। ধীরে ধীরে গিয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করে। কেমন একটা সংকোচ হয়, প্রথমে আড়চোখে চাহিয়া চাহিয়া শেষ পর্যন্ত বেশ সোজা হইয়াই ঠাকুরের দিকে চায়। মা যা বলিয়াছে ঠিকই তো মিলিয়া যাইতেছে—মেয়েই তো সরস্বতী ঠাকুর—ছোট একটি মেয়ে, মা অন্নপূর্ণা যতই ডাকুন কাজের জন্য, যতই বকুন, হাতে বাজনা লইয়া খালি মিটি-মিটি দুষ্টামির হাসি। মিটু যতই স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে ততই আর তার সন্দেহ থাকে না যে হাতে-খড়ির সময় সকালে যে হাসিটা অন্য-রকম মনে হইয়াছিল, আসলে সে হাসিটা দুষ্টামিতে ভরা। অনেকক্ষণ পর্যন্ত চাহিয়া চাহিয়া যখন আর কোনই পরিবর্তন দেখে না মিটু, বিষণ্ণ মনে ফিরিয়া যায়।

বাইরে দোর গোড়ায় বসিয়া মিটু হাঁটু দুটি দুই হাতে বেড়িয়া মুখ নিচু করিয়া বসিয়া থাকে—কোলের মধ্যে বই-স্লেট। অনেকক্ষণই থাকে বসিয়া, বাবা আফিস হইতে ফেরে, বলে, “ব্যাপার কি মিটুবাবু? —বিদ্যের চাপে একদিনেই যে নুইয়ে দিলেন মা সরস্বতী!”

উপরে উঠিয়া যায়। মিটু বসিয়াই থাকে। তাহার পর মিটুর মাথায় হঠাৎ এক বুদ্ধি খেলে। উঠিয়া সোজা চলিয়া যায় রান্নাঘরে। মা চায়ের জোগাড় করিতেছে, একটু বেশি ব্যস্ত আর গম্ভীর। মিটু ঘরের মাঝখানটায় একটু চুপ করিয়া দাঁড়ায়। কি করিয়া পাড়া যায় কথাটা?...এক সময় একটু দুলিয়া লইয়া বলে, “মা, হাতে-খড়ি হয়ে আমি খুব পড়ছি—দেখো, কালকে সেই...”

কেটলি নামাইতে নামাইতে মা বলে, "হ্যাঁ খুব পোড়ো, তাহ'লেই তো..."

'ব্যাপার কি মিটুবাবু?'

কথা একবার আরম্ভ হইয়া গেলে আর আটকায় না, মিটু বাধা দিয়া বলে, "বই তো ঠাকুর, না মা?"

"হ্যাঁ, খুব যত্ন করে..."

"অ্যাঁ মা, সরস্বতী ঠাকুরের হাতে-খড়ি হলে বই-ঠাকুরকে পড়বেন? —খুব ভালোও হয়ে যাবেন?"

"উনি আর মন্দ কবে যে···"

তাহার পর মনে পড়িয়া গেল আজ সকাল বেলার গল্প-করা ছেলের কাছে। চা ছাঁকিতে ছাঁকিতে ছেলের মুখের পানে চাহিয়া বলে, "ও হরি! তুমি বুঝি সেই সব কথা ধরে...তা হবেন না ভালো? হাতে-খড়ি হ'লে মতিগতি বদলায় না? এই তুই-ই তো খেলা দুষ্টুমি ছেড়ে খালি বই নিয়ে রয়েছিস কেমন। কত বাধ্য হয়েছিস। কিন্তু সর্ বাবা একটু এখন...আগুন, গরম জল, ওদিকে তাড়াতাড়ি··· তোকে বলব'খন আরও মা সরস্বতীর গল্প···"

মিটু ধীরে ধীরে নামিয়া যায়। ঠাকুরঘরেও যায় একবার—সেই এক ভাব, হাতে বাজনা, মুখে দুষ্টামি করিয়া না-শোনার হাসি।...মিটু যেন স্পষ্টই দেখে মা অন্নপূর্ণা ডাকিয়া ডাকিয়া সারা হইয়া যাইতেছেন—একলা মানুষ—আহা···

মিটু নামিয়া আবার সদরের দিকে চলিয়া যায়। মায়ের কথায় একটা সমস্যার কিছু মিটিল, কিন্তু আর একটা আসিয়া জুটিয়াছে। আকাশের চেয়েও তো বেশি বিদ্যা সরস্বতী ঠাকুরের, তবে আবার হাতে-খড়ির কি দরকার?···মিটু আবার সদর দরজায় হাঁটু মুড়িয়া বসে। বাবা ক্লাবে যাইবার জন্য জামা জুতা পরিয়া নামিয়া আসে। বলে, "তোমার হাতে-খড়ি ফিরিয়ে দাওগে মিটু, নিজের যত ভাবনার বোঝা তোমার ঘাড়ে চাপিয়েছেন মা সরস্বতী।"

বাহির হইয়া যায়।...ভাবিয়া ভাবিয়া এক সময় মিটু ভাবনার যেন কিনারা পায়।—ঠিক তো, হাতে-খড়ি না হইলে বিদ্যা থাকিয়াও যে

নাই! এই তো, তাহার নিজের কথাই ধরা যাক না—পেটে সমস্ত অ-আ-ক-খ, একে চন্দ্র দুইএ পক্ষ—কিছুই বাদ ছিল না, কিন্তু কোন কি সম্বন্ধ ছিল মিটুর সে সবের সঙ্গে?···তাহার পর যেই না হাতে-খড়ি হওয়া, ব্যস...

মিটুর মনটা কল্পনায় যেন নাচিয়া ওঠে।—সরস্বতী ঠাকুর বিসর্জনের পর বাড়ি ফিরিয়া গেছেন—হাতে এই ঘ্যান্‌ঘেনে বাজনাও নাই, মুখে এ দুষ্টামির হাসিও নাই—তাহার জায়গায় এক হাতে স্লেট, এক হাতে খড়ি—আর কী বাধ্য আর লক্ষ্মীটি হইয়া গেছেন!—ঠিক মিটু যেমন আজ হইয়া গেছে, রাস্তায় যায় নাই, খোকাকে কাঁদায় নাই।···আর কত কাজের হইয়া গেছেন সরস্বতী ঠাকুর!—মিটু কল্পনায় দেখে মা অন্নপূর্ণার আর সেরকম ব্যাকুল ভাবটা একটুও নাই মুখে—ভাঁড়ার ঘর, হেঁসেল যেখান থেকেই ডাক দিতেছেন, সরস্বতী গিয়া মুখটি বুজিয়া লক্ষ্মীটি হইয়া দাঁড়াইতেছেন, হাতে-খড়ির পর যে মতিগতি ফিরিয়া গেছে একেবারে···

তাহা হইলে কে দিয়া দেয় হাতে-খড়িটা সরস্বতী ঠাকুরের? মেজকাকার কাছেই যাইবে?

একটু অন্যধরণের লোক, বাবা আর মা'র মতো সব কাজে চট্ করিয়া রাজি করানো যায় না। তবুও একবার দেখা যাক্ না।

মেজকাকার দুয়ারের কাছাকাছি পর্যন্ত গিয়া মিটু আবার ফিরিল। মা'র কাছে গিয়া বলিল, "একটা পান দাও, মেজকাকা চাইছেন।"

মেজকাকা একটা চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িতেছে, মিটু চেয়ারের গায়ে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "এই নাও, পান খাও মেজকাকা।"

"আজ হঠাৎ এত দয়া যে মিটুবাবুর?"

মেজকাকা একটু বোঝে কম,—আজ মিটুর যে হাতে-খড়ি হইয়াছে

সেটা মনে নাই? কত লক্ষ্মী হইয়া গেছে মিটু! অবশ্য সেটা আর বলিল না, বলিল, "এমনি। মা বললে মিটু একটা পান খাবি? আমি বললাম—দুৎ, পান খেলে জিব মোটা হয়ে যায়, বিদ্যে হয় না। মেজকাকাকে দিগে।"

"মেজকাকার বুঝি বিদ্যের দরকার নেই?"

"তোমার তো অনেক আছে, সবার হাতে-খড়ি দাও⋯"

বই থেকে মুখ তুলিবার আগেই তাড়াতাড়ি আরও জুড়িয়া দেয়, "মেজকাকা, সরস্বতী-ঠাকুরের হাতে-খড়িটা দিয়ে দেবে?"

মেজকাকা বই থেকে মুখ তুলিয়া একটু হাসিয়া চায়, বলে, "তুমি সরো দিকিন একটু, আমার অত ছোট কাজের ফুরসৎ নেই। ডেঁপো কোথাকার!"

মেজকাকা ঐ রকম। এর পরেই মিটুর ইচ্ছা ছিল অন্নপূর্ণার সংসারের কথাটা তোলা। অবশ্য জানা কথা, কোন ফল হইত না। বাবা, মা, জেঠা, কাকা,—সবার মুখেই তো এক কথা—সংসারের কিচ্ছু বোঝে না মেজকাকা।

রাগ আর বিরক্তির মাথায় এই কথাটুকু লইয়া আক্রোশ মিটাইতে মিটাইতে মিটু আবার গিয়া সদর দোর-গোড়ায় হাঁটু মুড়িয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। আগে শুধু মা অন্নপূর্ণার দুঃখে দয়া ছিল, এখন আবার মেজকাকার উপর রাগে, জিদটা আরও বাড়িয়া গেছে, কেবলই মনে হইতেছে—সে নিজে যদি লিখিতে জানিত তো মেজকাকার ওরকম ঠাট্টা করিয়া উত্তর দেওয়ার মজাটা টের পাওয়াইত। ⋯অনেকক্ষণ একমনে ভাবিল মিটু, মার মতন মনে মনে মা দুর্গাকেও খুব ডাকিল, তাহার পর এই নিদারুণ সমস্যাটার একটা পাকারকম সমাধান হইল; মিটু উঠিয়া উপরে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়া বেশ একটু অন্ধকার হইয়াছে। মিটুর মা ঠাকুরের শীতলের জন্য উপরের ঘরে বসিয়া ফল কাটিতেছে, এমন সময় মিটুর ছোড়দা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল, চক্ষু দুইটা বড় বড় করিয়া বলিল, "কার জন্যে আর ফল কাটছ? দেখবে চলো—শীগ্‌গির..."

"কেনরে!"—বলিয়া মা উদ্বিগ্নভাবে চাহিতে বলিল, "এসো না, দেখবে; শেতলের জন্যে ধূপদানি করে আগুন নিয়ে যাচ্ছি—দোরের ফাঁক দিয়ে দিয়ে দেখি···চলো না, এতক্ষণ বোধ হয়···"

যখন বারান্দায় আসিয়াছে কানে গেল, "মাথায় পাগড়ি ঙ লে-খো—"

—মিটুর গলা, ভেজানো দুয়ার খুলিয়া দুইজনে ঘরের ভিতর গিয়া দাঁড়াইল। মায়ের চক্ষু স্থির!—

সরস্বতীর বীণাটি মেঝের মাঝখানে অবহেলা ভরে ফেলিয়া রাখা—। ডান হাতটি মিটুর হাতের মধ্যে, তাহাতে একটি পেন্সিল খড়ি, মিটু বাঁ হাতে তাহার ছোট স্লেটটা সেই খড়িতে লাগাইয়া ঠিক কোলে করার মতো করিয়া মূর্তির পিছনটিতে দাঁড়াইয়া আছে।

দাদা ছুটিয়া বাড়ির আর সবাইকে ডাকিয়া আনিতে গেল।

ভয়ে মার গলায় কান্না ঠেলিয়া আসিয়াছে, "পোড়ারবাঁদর, মার হাতে-খড়ি দেওয়া হচ্ছে? লেখাচ্ছি তোমায় মাথায় পাগড়ি 'ঙ'..."

হাত তুলিয়া অগ্রসর হইয়াছে, মিটুর মেজকাকা আসিয়া উপস্থিত হইয়া নিরস্ত করিল। চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া ডাকিল, "এদিকে আয়।···আমায় রাজি করাতে না পেরে আমার লেখা অক্ষর দিয়েই লেঠা চুকিয়ে নিচ্ছে!···এলি, না, যাব?"

মিটু ঠাকুরের চৌকি হইতে নামিতেই বোধ হয় ঠাকুরের মুকুটের পিছন দিকে আটকান একটা ক্যালেণ্ডার নিচে পড়িয়া গেল। মিটুর

দাদা গিয়া সেটা তুলিয়া আনিল। বলিল, "আমার ঘর থেকে খুলে এনেছে, হতভাগা!"

নিচে ইংরাজী মাসের তারিখ, উপরে বেশ বড় একটি যোগাসীন মহাদেবের ছবি, মাথার অনেক উপর পর্যন্ত গঙ্গা ঠেলিয়া উঠিয়াছে। বছরের হিসাব সমেত তাঁহার হঠাৎ এখানে আবির্ভাবের তাৎপর্যটা কেহ ধরিতে পারিল না।

মিটু বেশ আটঘাট বাঁধিয়াই সুরু করিয়াছিল: সকালে সকলে উঠিয়া যখন দেখিবে ঠাকুরের হাতে বাজনার বদলে স্লেট আর চক্-পেন্সিল, তখন নিশ্চয় ভাবিবে মহাদেব নিজেই আসিয়া মেয়ের প্রতি এই কর্তব্যটুকু সারিয়া লইয়াছেন। ব্যবস্থাটুকু কিন্তু টিকিল না,—সন্ধ্যার সময় 'শীতল' বলিয়া যে আবার পূজার একটু জের বাকি আছে বেচারির সেটুকু জানা ছিল না।······বকুনি, কানমলা—ওটুকু মিটু গ্রাহ্য করে না। শুধু দুঃখ রহিল—সুদূর কৈলাসে সেই কে মা অন্নপূর্ণার জন্য,—মাত্র মাথায় পাগড়ি 'ঙ' পর্যন্ত হাতে-খড়ি হইল—এতে অবুঝ কন্যার মতিগতি ভালো রকম ফিরিবে কি?

[আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫১]

গোবিন্দ-মাসী

আমি যখন পৌঁছিলাম তখন গোবিন্দ-মাসী একেবারে সপ্তমে চড়িয়া রহিয়াছেন। পরণে একটা ছোট ভিজে ডুরে শাড়ি; গায়ে একটা ভিজে গামছা, সামনে আর পিছনে কোমরের কাপড়ে গোঁজা; মাথায় ছোট করিয়া ছাঁটা চুলের উপর কোন আচ্ছাদন নাই। রোয়াকে দাঁড়াইয়া একটু কুঁজো হইয়া গলা ছাড়িয়া দিয়াছেন, দুটি হাত আর দশটি আঙ্গুল নানা ভঙ্গী সহকারে বক্তব্যগুলিকে রূপায়িত করিতেছে।

—"সইবে না—সইবে না, যাবি! আমি এই শিবরাত্তিরের উপোস করে পাতোব্বাক্যে বলছি—যাবি···"

ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম অপর পক্ষ খিড়কির পুকুরের ওদিককার ঘাটে। মূল গায়েন রসময়-কাকার পরিবার—আমাদের বিন্দু-খুড়ি, সঙ্গে দুটি মেয়ে দোয়ার দিতেছে। খুব পাকা ওস্তাদ গানের মধ্যেও যেমন প্রয়োজন হইলে এক আধটা অবান্তর কথা বলিয়া লয়, আবার তালও ঠিক রাখিয়া যায়, সেই ভাবে আমায় দেখিয়াই মাসি একবার বলিলেন, "ঘরে গিয়ে বোস্ শৈল, এলুম বলে"—তারপর আবার সেইরূপ পূর্ণোদ্যমে লাগাইয়া দিলেন—"সইবে না—সইবে না, আগে একটি একটি করে সবগুণো খাবি, তারপর নিজে যাবি—তার পর, তার আগে নয়—সোয়ামির গুমুরে, বেটার গুমুরে মট্‌মট্ করছিস—দেখবি আমি যদি সতী হই, থাকবে না গুমোর, ভালো-খাকী-ই-ই-ই..., শতেক-খোয়ারী-ই-ই-ই···"

নমুনা মাত্র দিলাম। নিজের কেহ নয়, গ্রাম সম্পর্কে মাসী; বিধবা, তাহার উপর একরকম নিঃসঙ্গ, আসিলে দেখাটা করি। প্রায়

মিনিট কুড়ি ধরিয়া অসহায়ভাবে এই ধরণের মন্তব্য সব শুনিতে লাগিলাম। বসিতেও পারি না, যাইতেও পারি না। মাসী ভাবাবেশ খুব বেশি হইলে, খুব লাগসই একটা নূতন কথা যোগাইলে "শৈল বোস্, এলাম এই"—বলিয়া তর্-তর্ করিয়া উঠান পর্যন্ত নামিয়া যান, আবার ফিরিয়া আসিয়া রোয়াকে দাঁড়ান—উঠানটা যেমন কাছে পড়ে, রোয়াকটা তেমনি আবার উঁচু, স্থবিধা অনেক—গালাগালি অনর্গল চলিতে থাকে, ওরা তিনজনে পাল্লা দিয়া উঠিতে পারে না। এক একবার যেন অল্প একটু ধরণের মতো হয়, মাসী ঘুরিয়া ঘরের পানে পা বাড়ান, আমি প্রণামটা সারিয়া লইতে উঠি, তাহার পর আবার কি মনে পড়িয়া যায়, মাসী গলা ফাটাইয়া একেবারে উঠানের ও-কোণ পর্যন্ত হন্ হন্ করিয়া নামিয়া যান, মনের বোঝা নামাইয়া আবার রোয়াকের উপর আসিয়া নূতন স্থত্র ধরেন—"ঐ যে সোয়ামির দশটা টাকা মাইনে বেড়েছে, ঠ্যাকারে পা পড়ছে না মাটিতে, ও টাকা আর আপিস থেকে হাতে করে নিয়ে আসতে হবে না, দেখিস; আমি যদি কায়মন বাক্যে বুড়ো-শিবের মাথায় বিল্বিপত্র চড়িয়ে থাকি, আমি যদি…"

একবার ঢুকিতে হইল, প্রশ্ন করিলাম, "মাসীর কি এখনও দেরি হবে? তাহ'লে আমি একবার ওপাড়া থেকে হয়ে আসি।"

মাসী মন্তব্যগুলাকে খুব দ্রুত চরমে লইয়া আসিয়া হঠাৎ বন্ধ করিয়া দিলেন। ঘরে আসিয়া আত্মগত ভাবে শুধু একবার—"মরণ, শতেকখোয়ারী!"—বলিয়া একেবারে নিতান্ত সহজ আলাপের স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "তারপর, কবে এলি শৈল? মাসীকে মনে পড়ল এতদিন পরে? আচে সব কেমন বাড়িতে? আর, কার মুখে যেন শুনলুম ভালো একটি চাক্‌রি হয়েছে—বেশ—বেশ—তা হবে না?… "

'...ভালো-খাকী-ই-ই-ই..., শতেক-খোয়ারী-ই-ই-ই...'

"এলাম এই আজ সকালে, ভাবলাম, যাই মাসীমার সঙ্গে..."

প্রশ্নে একটু বিরতি পাইয়া উত্তর দিতে যাইতেছিলাম, মাসী হঠাৎ ঘুরিয়া চিৎকার করিতে করিতে উঠানে নামিয়া চলিলেন,—"বেটার

চাক্‌রির আশা, হয় নি এখনও, তাইতেই এত গো, তাইতেই এতো! হবে নাকি ও চাকরি? শিবরাত্তিরের উপোস করে এখনও বাসি মুখে আছি, এই পাতোব্বাক্যে বলছি···”

দেখিলাম ঘাটে কেহই নাই, আমার চাকরির কথায় এটুকু মনে পড়িয়া যাওয়ায় অন্ধ আবেগেই মাসী একটানা নামিয়া গেছেন। যাই হোক, কেহ না থাকিলেও মন্তব্যটা পুরাপুরিই সমাপ্ত করিয়া আবার উঠিয়া আসিলেন, একটু গলা নামাইয়া আক্রোশের কণ্ঠেই বলিলেন, “ছেলেটা মাসী বলে এসেছে, থির হয়ে যে দুটো কথা কইব, তা দেবে কইতে? থেকে থেকে গা জ্বলে ওঠে—থেকে থেকে গা জ্বলে ওঠে!”

তাহার পরই পূর্ব মূর্তি, স্নেহকণ্ঠে প্রশ্ন। ঠিক যেন এখনই যে ব্যাপারটা হইল সেটা কপাট আঁটিয়া আলাদা করিয়া দিলেন।

পূজার জোগাড করিতে করিতে মাঝপথেই রসময়-গৃহিণীর মোহাড়া লইতে উঠিয়াছিলেন, আবার চন্দন ঘষিতে আরম্ভ করিলেন। গল্প চলিতে লাগিল, অবশ্য একতরফা, আমি একরকম শ্রোতামাত্র। গোবিন্দ-মাসীর গল্প প্রায় একতরফাই হয়, নিতান্ত তেমন প্রতিপক্ষ না পাইলে কলহও ওঁর একতরফা। আহারের জন্য জিদ ধরিয়া বসিলেন—“ও মা, না খেয়ে মাসীর এখান থেকে যাবি—কেমন করে কথাটা মুখ দিয়ে বের করলি, শৈল? খেয়ে যাবি এক মুটো ভাতে-ভাত—মাসীর তো আর কিছু খাওয়াবার সাধ্যি নেই, তার ওপর আজ আমার মাছের হাঙ্গামও করতে নেই; তা হোক মাছের দাগাটাই তো বড় নয়—বড় হচ্ছে মা-মাসীর হাতের রান্না—‘না’ বল্‌ একবার, চুপ করে রইলি যে! বড়ঠাকুরকে···”

"সে তো ভাগ্যি..." বলিয়া আরম্ভ করিতে যাইতেছিলাম, মাসী হঠাৎ হন্তদন্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। আবার গলার আওয়াজটা বাড়িয়া গেল, "দেখেছ? বলে, কেন বলো! আবাগী কিছু মনে থাকতে দেবে? ভাগ্যিস শৈলর সঙ্গে কথায় কথায় নামটা মুখে এসে গেল, নইলে হয়েছিল তো এক্ষুনি? বলে, কেন বলো?...শৈল, বোস্ একটু বাবা..."

গর গর করিতে করিতে পাশের ঘরে গিয়া মাসী একটা মোটা গরদের কাপড় পরিয়া আসিলেন। একটা পাথরের বাটিতে মিছরি ভিজিতেছিল, সরবৎ করিয়া একটা শ্বেতপাথরের গেলাসে ঢালিয়া খানিকটা নেবুর রস মিশ্রিত করিয়া দিলেন। মুগের ডাল ভিজিতেছিল, যত্ন সহকারে বাছিয়া পরিষ্কার করিয়া একটা রেকাবিতে রাখিলেন, কয়েক রকম ফল কাটা ছিল, খানিটা শাঁকালু কাটিয়া, সবগুলা গুছাইয়া একপাশে রাখিলেন, মাঝখানে খানিকটা ছানা, চিনি আর তাহারই পাশে গোটা চারেক সন্দেশ রাখিলেন...বাক্যস্রোত সঙ্গে বহিয়াই চলিয়াছে—"মাথার ঠিক থাকে কখনও এতে মানুষের—মুয়ে আগুন—ঠ্যাকার দেখাতে এসেছেন—মুড়ো জ্বেলে দিই অমন ঠ্যাকারে...একটা লোককে বামুন হতে বলেছি, তার যে ব্যবস্থা করতে হবে—মনের ঠিক থাকতে দেবে তবে তো মনে থাকবে মানুষের..."

এক হাতে রেকাবি আর এক হাতে সরবতের গেলাসটা লইয়া মাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "এই এলুম বলে, একটু বোস্ শৈল, বড়ঠাকুরকে ছানা আর সরবৎটুকু দিয়ে আসি।"

নিতান্ত কৌতুহলবশেই প্রশ্ন করিলাম, "কাকে মাসীমা? কতদুর যাবে?"

"কতদূর আবার?—ঐ আবাগীর বাড়ি। বড়ঠাকুরকে খেতে বললাম না?...দেখ, হাঁ করে রইল!...নাম কি করে করব রে হাবা!...সুধীর বাপ—ঐ আবাগীর বর!—এইবার মাথায় ঢুকল?... দেখ, তবু হাঁদার মতন হাঁ করে রয়েছে!"

মাসী আমার মূঢ়তায় হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

বলিলাম, "সে কি মাসী, তুমি যে এক্ষুনি কোনও গালই বাকি রাখলে না তাঁকে দিতে! ঐ রসময়-কাকা তো?"

মাসী বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, এত বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন যে সে বিস্ময়ের কাছে আমার বিস্ময় কিছুই নয়, হাতের রেকাবিটা পাশেই চৌকির উপর রাখিয়া চারটি আঙ্গুল দিয়া নিজের গাল চাপিয়া চক্ষু বড় করিয়া বলিলেন, "তুই যে অবাক করলি আমায়, আমি ওঁকে গাল দোব? সুধীর বাপ হলেন আমার ভাসুর। সুধীর পিসি বেলপুকুরের সম্পর্কে আমার ননদ, তার দাদা আমার ভাসুর হ'ল না? তাঁর নাম আমার মুখে আনতে নেই, আর তাঁকে গাল দোব? ...তিন তিনটে পাস দিলি, তোর বুদ্ধিসুদ্ধি কবে হবে রে শৈল?"

বিস্মিত হইলেও হাসিয়াই বলিলাম, "এতক্ষণ তবে কি শুনলাম, মাসীমা?"

"ও সে সব ঐ আবাগীকে, ঐ উনুন-মুখীকে। দোব না গাল? সোয়ামী-পুত কি কারুর করে না রোজগার? তাই অত ঠ্যাকার করে..."

হাসিয়াই বলিলাম, "ওর সবগুণোই যে রসময়-কাকা আর ওঁদের ছেলেকে..."

বিস্ময়ের চোটে মাসী সরবতের গেলাসটাও নামাইয়া রাখিলেন, বলিলেন, "তুই বলিস কিরে শৈল, গুরুজন, নাম পর্যন্ত মুখে আনতে

নেই, তাঁকে গালাগাল দোব আমি? আবার অমন সোনার চাঁদ ছেলেকেও? ষাট ষাট, বেঁচে থাক্, বাড়বাড়ন্ত হোক, আমার মাথার যত চুল তত পরমায়ু হোক···আমি গাল দিলুম ঐ উনুন-মুখীকে···তোর বুদ্ধিসুদ্ধি কবে হবে রে শৈল?···"

শৈলর বুদ্ধির অবস্থায় নিরতিশয় নৈরাশ্য এবং বিস্ময়ে একটু অন্যমনস্ক হইয়াই রেকাবি আর গেলাস তুলিয়া লইয়া গোবিন্দ-মাসী ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

[খেয়া, বৈশাখ ১৩৫২]

সহযাত্রিণী ও সহধর্মিণী

হুইশিল দিয়া ইঞ্জিন স্টার্ট্ লইয়াছে, এমন সময় প্রায় ছুটিতে ছুটিতে দুইটি মেয়ে আমাদের গাড়ির সামনে আসিয়া পড়িল। নিরাশায়, উদ্বেগে মুখ-চোখের ভাব অবর্ণনীয়। সামনে, খানিকটা দূরে সেকেণ্ড ক্লাস ; তাহার জানালা হইতে একজন বর্ষীয়সী মহিলা ও তিন চারজন মেয়ে উৎসুকভাবে গলা বাড়াইয়া ইহাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, মহিলাটি বলিলেন, "আর এগিয়ো না, তোমরা ওই গাড়িতেই উঠে পড়ো।"

আমরা প্ল্যাটফর্মের দিকের বেঞ্চটাতেই বসিয়াছিলাম, আমি তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলিয়া দিলাম···দ্বিতীয় মেয়েটি যখন চড়িতে যাইবে তখন একটু বেগ হইয়াছে গাড়ির। সামান্য একটু ইতস্তত: করিয়া মেয়েটির হাত ধরিয়া উঠিয়া আসিতে সাহায্য করিলাম। সমর আমার মুখের পানে একবার বিস্মিতভাবে চাহিল। মেয়েটি ভিতরে আসিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া বলিল, "থ্যাংক্স্।"

ছোট ইণ্টার ক্লাস কামরা। ওদিকের দুটি বেঞ্চে একজন মারোয়াড়ি ভদ্রলোক এবং তাহার স্ত্রী বিছানা পাতিয়াছে। এদিককার বেঞ্চে আমি আর সমর, সামনের বেঞ্চটি খালি। মেয়ে দুইটি একবার গাড়িটা দেখিয়া লইয়া খালি বেঞ্চটায় বসিয়া পড়িল। দারুণ উদ্বেগের পর নিশ্চিন্ততার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শেষের মেয়েটি বলিল, "খুব পাওয়া গেল গাড়িটা !"

প্রশ্ন করিলাম, "কোথায় যাবেন আপনারা ?"

সমর চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া আবার আমার মুখের পানে চাহিল।—হাত ধরিয়া তুলিলাম, আবার আলাপ জমাইতে চাই!—আমার ধৃষ্টতা বা দুঃসাহসটা সে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। একেবারে আধুনিক প্রথায় সজ্জিত মেয়ে দুইটি—মায় মণিবন্ধের উপর ঝোলানো ভ্যানিটি ব্যাগ্ পর্যন্ত। কথাবার্তায়, গতিবিধিতে একটুও আড়ষ্টভাব নাই; তবে একেবারে নির্লজ্জতা নয়,—বেশ একটি প্রফুল্ল, সপ্রতিভ ভাব। যাহাকে প্রশ্ন করিলাম, সে কপালের কয়েকগাছা স্বেদসিক্ত বিস্রস্ত কেশ আঙুলের ডগা দিয়া গুছাইয়া লইয়া বলিল, "যাব সেরামপুর, নেক্স্ট্ স্টপেজ। আপনারা?"

যেমন আমার দিকে চাহিয়াছিল, অনেকটা সেই রকম ভাবেই সমর এবার মেয়েটির পানে চাহিল।

আমি বলিলাম, "আমরা যাচ্ছি বর্ধমান...আপনারা আর একটু হ'লেই ফেল করতেন গাড়িটা।"

মেয়েটি একটু হাসিয়া মাথাটি ঈষৎ নোয়াইয়া বলিল, "ফেল তো করেইছিলাম। আপনি সাহায্য না করলে..."

তাহার পর সঙ্গিনীর পানে চাহিয়া বলিল, "দোষ তোমার ইলা, আমি অত করে বললাম..."

ইলা বলিল, "তাহ'লেও আমরা ঠিক সময়ে পৌঁছুতাম, দু' জায়গায় ট্রাফিক পুলিস যে অনেকক্ষণ আটকে রাখলে ট্যাক্সিটা।...এমন রাগ ধরছিল!..."

অপর মেয়েটি সাক্ষী হিসাবে একবার আমার মুখের পানে চাহিয়া ইলাকে বলিল, "বা রে, তারা নিজের ডিউটি করবে না?"

ইলা মুখটি কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "ছাই ডিউটি, পরের গাড়ি ফেল করবার জোগাড় করে!"

আমরা দু'জনেই হাসিয়া উঠিলাম, এমন কি সমর পর্যন্ত না যোগ দিয়া পারিল না।

খানিকটা চুপচাপ গেল। মারোয়াড়ি ভদ্রলোক তাহার স্ত্রীকে কি একটা বলিল, সে আবক্ষ অবগুণ্ঠনশুদ্ধ মুখটা একবার আমাদের পানে ফিরাইয়া আবার ঘুরাইয়া লইল। গাড়ি তখন উগ্র শব্দের সঙ্গে লিলুয়া স্টেশন পার হইতেছে। সমর আমার কানের একটু কাছে মুখটা আনিয়া বলিল, "কোথায় যাচ্ছেন এঁরা ?"

—অর্থাৎ কথাবার্তাটা চালাইতে চায়। বলিলাম, "জিগ্যেস্ কর্ না কেন ? আমি কি করে জানব ?"

সমর একবার বক্রদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল একটু, তারপর বুকে যেন খানিকটা দম ভরিয়া লইল এবং গাড়ির আওয়াজটা নরম হইলে স্খলিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "তা—ইয়ে—আপনারা—যাচ্ছেন কোথায় ?"

দু'জনে সমরের পানে চাহিল, তাহার পর তাহাদের মুখ দু'খানি ধীরে ধীরে যেন দীপ্ত হইয়া উঠিল। ইলা অপর মেয়েটির পানে চাহিল। সে-ই হাসিয়া বলিল, "আমরা বেরিয়েছি রবিবার করতে। সেরামপুরে নেবে ট্যাক্সিতে করে সোজা ঘাটে যাব। নৌকো করে একেবারে ব্যারাকপুরের কোম্পানির বাগানে। পারমিশান্ নেওয়া আছে, সেখানে পিক্‌নিক্ হবে। আবার ট্যাক্সি করে বরানগর, সেখান থেকে স্টীমারে জগন্নাথ ঘাট।"

ইলা হাসিয়া পূরণ করিয়া দিল, "তারপর আবার বন্দী—অন্ততঃ হপ্তাখানেকের জন্যে তো বটেই।"

সেই চিন্তাতেই যেন মুক্তির মধ্যে ওরা দু'জনে আর কোন খুঁৎই থাকিতে দিবে না।

এতগুলি বাক্যের স্রোতে সমরের অবশিষ্ট জড়তাটুকু যেন ভাসাইয়া লইয়া গেল; প্রশ্ন করিল, "আসছেন কোথা থেকে আপনারা ?"

"ভিক্টোরিয়া বোর্ডিং থেকে।"

"কলেজে পড়েন ?"

"হ্যাঁ।"

"সেকেণ্ড ক্লাসে উনি কে ?"

"আমাদের বোর্ডিঙের লেডি রেকটার, মিস্ নাগ। ওঁর সঙ্গে আরও পাঁচজন সঙ্গিনী আছে আমাদের। আমরাই সমস্ত রেলজার্নিটা আলাদা পড়ে গেলাম !"

কথাটা বলিয়া দুইজনেই একটু বিষণ্ণ হইয়া পড়িল, এই নৈরাশ্যের মুখে আমরাও আর কিছু বলিতে পারিলাম না। সমর শুধু একবার আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া প্রশ্ন করিল, "বলা চলবে যে—আমাদের সৌভাগ্য ?"

চাপা গলায় বলিলাম, "মাথা খারাপ হয়েছে !"

সমর একটু দমিয়া গেল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর আবার কখন কথাবার্তা অল্পে অল্পে জমিয়া উঠিল। সমর এক সুযোগে আমাদেরও পরিচয় দিয়া দিল। তখন কলেজের পড়াশুনা লইয়া খানিকক্ষণ আলোচনা হইল, তাহার পর রাজনীতি, তাহার পর খানিকটা বিশ্বসাহিত্যও। গাড়ি রিষড়া যখন পার হইল তখন নারী-প্রগতি চলিতেছে;—তর্ক নয়, কেন না চারজনেই স্বপক্ষে—আমরা দুইজন মেয়ে দুইটির চেয়েও বেশি স্বপক্ষে; সমর আবার এত বেশি যে, নারী-প্রগতি গতিবেগে আমাদের গাড়িটাকে পিছনে ফেলিয়া গেলেও যেন তাহার আশ মিটিবে না।

আলোচনাটা শেষ পর্যন্ত সে-ই প্রায় একচেটে করিয়া লইল এবং প্রগতির উদ্দীপনায় সামনেই অবগুণ্ঠিতা মারোয়াড়ি মহিলার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া পুরুষজাতির উপর এমন উগ্র রকম খাপ্পা হইয়া উঠিল যে গাড়িটা এই সময় শ্রীরামপুরে আসিয়া থামিয়া না গেলে ব্যাপারটা যে কোথা পর্যন্ত গড়াইত বলা যায় না।

গাড়ি থামিতেই সমর চট্ করিয়া দরজা খুলিয়া নামিয়া গেল এবং খাঁটি প্রগত দেশের প্রথায় হাত ধরিয়া মেয়ে দুইটিকে নামিয়া আসিতে সাহায্য করিল।

এবার আমার পালা,—বিস্ময়ে সমরের চেয়েও চক্ষু অধিক বিস্ফারিত করিয়া থ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

খানিকটা পর্যন্ত সমর নির্বাক নিস্পন্দ হইয়া জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর একটা টানা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইল। প্রশ্ন করিলাম, "ব্যাপারখানা কি?"

সমর উত্তর না দিয়া প্রশ্ন করিল, "শৈল, আমরা কি বিয়ে করি?"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিতে মারোয়াড়ির দিকে ইসারা করিয়া বলিল, "ধর্—ঐ যে একটা গোটা মানুষ জরির কাজ-করা কাপড়ে ঢাকা একটা পুঁটলি ঘাড়ে করে বেড়াচ্ছে—এই ব্যাপারটাকে কি বিবাহ বলতে হবে?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "বিবাহ কথাটার ব্যুৎপত্তিগত মানে যদি হয় বিশিষ্টরূপে বহন করা, তাহ'লে বহন করবার জিনিসটি যতই জড়-পদার্থ গোছের হয়, মানেটা ততই স্পষ্ট হয় না কি?"

সমর মুখটা কঠিন করিয়া বলিল, "ঠাট্টা নয়; ও-রকম বিবাহ আমার দ্বারা হবে না। আমি চাই মানুষকে বিবাহ করতে, যে মানুষ অবাধ মুক্তির মাঝে পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পেরেছে, যে চলবে,

হাসবে, কথা কইবে, মুক্ত দৃষ্টিতে অকুণ্ঠিতভাবে পৃথিবীর পানে চেয়ে দেখতে পারবে, সে হবে আমার সঙ্গিনী, আমার মাথার মোট নয়—যে সত্যিই হবে সখী।

"দেখলি তো? গাড়ির ছ'জন প্রাণীর মধ্যে মাত্র দু'জন নেমে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে কী পরিবর্তন! গাড়িটার আর জান আছে বলে মনে হচ্ছে? যদি বিশিষ্টরূপে বহন করতে হয় তো আমি করব এই প্রাণস্বরূপিনী নারীকে।...প্রাণের প্রাচুর্যে যার মধ্যে এতটুকু দ্বিধা নেই, মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ সম্বন্ধ যে মানতে একটুও ইতস্তত: করবে না...আচ্ছা শৈল, এই তো তুই হাত ধরে তুললি, আমিও নামালাম হাত ধরে, এতটুকু কুণ্ঠা দেখতে পেলি? কথাবার্তায় এতটুকু জড়তা?...অপরিচয়ের মধ্যেও যে এত নিকট হতে পারল, বল্ তো—জীবনে যদি তাকে একেবারে আপন করে পাওয়ার সৌভাগ্য হয় তো..."

শেওড়াফুলিতে গাড়ি ঢুকিতে "সমর!" বলিয়া একটা আওয়াজ হইল, দুজনেই মুখ বাড়াইয়া দেখি আশিস হাত উঠাইয়া ছুটিয়া আসিতেছে।...সেদিন ঐ পর্যন্ত রহিল।

বেশি দিন নয়, মাস তিনেক পরের কথা। সমর আর আমি সমরের জন্য শ্যামবাজারে মেয়ে দেখিতে গিয়াছি। মেয়েটি আই-এ পরীক্ষা দিয়াছে। সমরের কাকা প্রভৃতি একবার দেখিয়া আসিয়াছেন। আমরা দ্বিতীয় ব্যাচ্...সমর প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, অন্তত: আই-এর নিচে কন্যা গ্রহণ করিবে না।

যথাসময়ে, কিঞ্চিৎ জলযোগের পর, মেয়েটিকে সঙ্গে আনিয়া সামনের গালিচায় বসানো হইল। মুখের দিকে ভালো করিয়া চাহিয়া

আমি বিস্ময়ে আনন্দে যেন কি একরকম হইয়া গেলাম। ওদিকেও একটা সংযত বিস্ময়! সমরের দিকে চাহিয়া দেখি সে তখনও কুণ্ঠা ঠেলিয়া মুখটা তুলিতে পারে নাই; বুড়া আঙুল দিয়া তাহার উরুতে একটা ঠেলা দিয়া কানে কানে বলিলাম, "কে দেখ্!"

সমর মুখটা তুলিল, মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া একটা ভ্রূকুটি করিয়া রহিল, যেন কি একটা মনে করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার পর তাহার মুখটা যেন ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হইয়া গেল।

বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। বাড়ি আসিতে পথে প্রশ্ন করিলাম, "কেন রে, কি হ'ল?"

অনেক পীড়াপীড়ির পর বলিল, "নাঃ, টু ফরওয়ার্ড; দেখলি না—সেদিন?"

আমি বলিলাম, "ওকে ফরওয়ার্ড বলা চলে না, কলেজে পড়া, হদ্দ একটু স্মার্ট, বাজে সংকোচের ধার ধারে না..."

সমর আমার উপর একেবারে চটিয়া উঠিল, বলিল, "ধার ধারে না বলে একেবারে ঘাড়ে এসে পড়বে ঐ সামান্য পরিচয়ে? অপরিচিতের হাতে হাত দিয়ে ওঠা-নামা করতে একটুও কেঁপে উঠবে না তার হাতটা?"

কপালে যুক্তকর ঠেকাইয়া বলিল, "এই যদি তোর স্মার্টের আইডিয়া হয় তো মাফ করো, ভাই!"

[সচিত্র ভারত, ২৫ কার্তিক, ১৩৪৬]

ভারতীয় চা

কাল ইহাদের সকলকে লইয়া সিনেমায় গিয়াছিলাম। সিনেমার খুব যে ভক্ত আমি তাহা নয়। বাড়ি থেকে চা-য়ের নির্বাসনের চেষ্টা করিতেছি। সকালে শেষবারের মতো সকলে চা পান করিয়া লইবার পর ভবতোষের একচোট লেকচার হইল। আচার্য রায়ের প্রিয় ছাত্র ভবতোষ; কয়েকদিন হইল কলিকাতা হইতে আসিয়াছে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছে আমাদের সহর হইতে চা তাড়াইয়া তবে জলগ্রহণ করিবে। সত্যই আজ প্রায় পনের দিন হইতে জলগ্রহণ করে নাই, শুধু চা খাইয়াই আছে। আমাদের লইয়া প্রায় চল্লিশটি পরিবারে চা বন্ধ করিল। ঐ এক পদ্ধতি—অর্থাৎ একটা ছোটখাট অনুষ্ঠানের মতো করিয়া, শেষবারের মতো এক কাপ পান করিয়া চাকে চিরদিনের মতো বিদায় দেওয়া। প্রতি অনুষ্ঠানেই ভবতোষ উপস্থিত থাকে, একটা করিয়া ওজস্বিনী বক্তৃতা দেয়, সেই পরিবারের পক্ষ হইতে শেষবারের মতো এককাপ চা পান করে, তাহার পর অন্য এক পরিবারে হানা দেয়। সমস্ত পাড়াটায় চায়ের বিরুদ্ধে একটা সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে।

চিরদিনের অভ্যাস; সন্ধ্যার সময় শরীরটা সবারই একটু ম্যাজ ম্যাজ করিবেই, তাই এই সিনেমার বন্দোবস্ত করিয়াছি। ওই সময়টুকু একটু করিয়া অন্যমনস্ক ভাবে কাটাইয়া দিতে পারিলে আজকের দিনটার মতো নিশ্চিন্ত। এই করিয়া মোহড়াটা তো সামলানো যাক, তাহার পর ক্রমেই একটু একটু করিয়া অভ্যাস ছাড়িয়া যাইবে। ছেলেমেয়েগুলার তো খুব উৎসাহ, ভবতোষ-কাকার প্রশংসায় এবং

চায়ের নিন্দায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছে, এমন কি গৃহিনী পর্যন্ত মাঝে মাঝে যোগান না দিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। দিন চার পাঁচ এই রকম উৎসাহটা যদি থাকিয়া যায় তাহা হইলে আর দেখিতে হইবে না। গৃহিনী সম্বন্ধেই একটু বেশি সতর্ক হওয়া,—তাঁর বাবা আবার চা-বাগানের ডাক্তার, সমস্ত শরীরটি যেন চায়ে জারানো ;···এখন পর্যন্ত উৎসাহ দেখাইয়া আসিয়াছেন মন্দ নয়, তবে উহারই মধ্যে—"তা ছাড়া টাকা বাঁচবে এক কাঁড়ি"—বলিয়া ছোট্ট একটি অভিমত দিতে ভুলেন নাই। আমার মনে হয় বাক্যটি সরল অভিমত মাত্র নয়, আমার মিত-ব্যয়িতার সহিত ইহার কিছু সম্বন্ধ আছে। একটু সশঙ্ক হইয়া আছি।

সিনেমায় প্রথমেই একটি side film বা ক্রোড়চিত্র আরম্ভ করিল। চিত্রটি এই—

লক্ষ্মণের বক্ষে দুরন্ত দশানন শক্তিশেল হানিয়াছে'। রামচন্দ্র বিলাপ করিতে করিতে মূৰ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছেন। নল, নীল, গয়, গবাক্ষ, অঙ্গদ, জাম্ববান সকলেই মুহ্যমান। সীতা উদ্ধার তো দূরের কথা, এখন ভ্রাতৃশোকে বোধ হয় রামচন্দ্রেরও প্রাণ সংশয় ঘটে। এমন সময় দেবলোক থেকে দেবতারা সুষেণকে পাঠাইয়া দিলেন। ভীষকবর দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, "ওষুধ তো এর রয়েছেই— হাতীও নয় ঘোড়াও নয়, একটি অনাড়ম্বর গুল্মমাত্র ; কিন্তু সংগ্রহ করাই দুঃসাধ্য।"

জাম্ববান, সুগ্রীব, অঙ্গদ প্রভৃতি সকলে এক সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "হে ভীষকর্ষভ, স্বর্গ, মর্ত, পাতালের কোনখানে যদি সে-গুল্ম পাওয়া যায় তো সংগ্রহ করা মদ্বিধ রামানুচরদের পক্ষে কিছুই দুঃসাধ্য নয়, সুতরাং যথারুচি আজ্ঞা আপনি নিংসকোচে করুন"—বলিয়া সাড়ম্বরে স্ব স্ব কীর্তি ব্যাখ্যান করিতে লাগিলেন।

ভীষকরাজ স্মিতবদনে বলিলেন, "স্বর্গেও যেতে হবে না, পাতালেও যেতে হবে না, গুল্ম এই মর্তেই পাওয়া যাবে, তবে সংগ্রহ করে আনা দুঃসাধ্য এই জন্য বলছি যে সে-গুল্ম হস্তদ্বারা স্পর্শ করলেই তার আরোগ্য-বিধায়িনী শক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। গুল্মটিকে তার জন্মস্থান থেকে সোজা একেবারে এখানে এনে হাজির করতে হবে।"

শুনিয়া সবার তো মাথা হেঁট। হনুমান একপ্রান্তে বসিয়া ছিলেন, রামচন্দ্রের দিকে চাহিয়া করজোড়ে বলিলেন, "বড় বড় কীর্তির গৌরব করতে পারে না আপনার এই দাসানুদাস, কেননা সাগর-লঙ্ঘন, সেতুবন্ধন প্রভৃতি যা কিছু করেছি তা প্রভুর নামের জোরেই। যদি আজ্ঞা হয় দাসকে তো আবার সেই রামনাম নিয়ে চেষ্টা করে দেখি বিশল্যকরণী এনে হাজির করতে পারি কিনা।"

সুষেণ প্রাপ্তিস্থান আর যাওয়ার রাস্তা সম্বন্ধে সঠিক বৃত্তান্ত দিলে হনুমান 'জয়রাম' বলিয়া এক লম্ফ দিলেন এবং যথাসময়ে দার্জিলিঙের নিকট হইতে গন্ধমাদন নামক হিমালয়ের অংশবিশেষের চূড়া উপড়াইয়া লইয়া অন্য এক লম্ফে লঙ্কায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুষেণ তাড়াতাড়ি সেই পর্বতশৃঙ্গ হইতে প্রয়োজনীয় গুল্মের পাতা কিছু সংগ্রহ করিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া লইলেন। অতঃপর স্বর্ণাভ সেই উষ্ণ জলে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও শর্করা মিশ্রিত করিয়া লক্ষ্মণের অধরোষ্ঠের মধ্যে ঢালিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্মণ "অস্ত্র কই, অস্ত্র কই ?" বলিয়া একেবারে ধড়ফড়াইয়া জাগিয়া উঠিলেন।

এই পর্যন্ত শেষ হইলে একজন হ্যাটকোটধারী রূপালী পর্দায় আবির্ভূত হইয়া মাথা থেকে হ্যাটটা খুলিয়া বলিল, "অতএব আপনারা সকলেই এই বিশল্যকরণী ভারতীয় চা পান করুন। বর্তমান যুগের কঠোর জীবনসংগ্রামে ক্লান্তি ও অবসাদরূপ শক্তিশেলে যাঁহারা জরজর,

আবার সংগ্রামের জন্য তাঁহাদের পূর্ণোদ্যম ফিরাইয়া আনিতে ভারতীয় চায়ের মতো আর কিছুই নাই। রামায়ণের বিশল্যকরণী হিমালয়-জাত ভারতীয় চা ব্যতীত যে অন্য কিছুই নহে এ কথা আজ বৈজ্ঞানিক মাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন।”

একটা হাসি পড়িয়া গেল। আমিও হাসিয়া গৃহিনীর দিকে চাহিয়া দেখিতেই মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। গৃহিনী হাই তুলিয়া আড়ামোড়া ভাঙিয়া বলিলেন, “মন্দ বলে নি বাপু, ঐ রকম একটা কিছু গুণ যেন আছেই জিনিসটাতে,—তা তোমার আর আচার্য রায়ের পেয়ারের ভবতোষবাবু যাই বলুন···একটা দিন পেটে পড়েনি,—যেন কার শরীর বয়ে বেড়াচ্ছি। বেশ তো কলকাতায় ছিলেন, আবার এখানে এসে এসব উপদ্রব করবার কি দরকার ছিল বলোদিকিন!”

আমি সাহস করিয়া আর কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। ক্ষুণ্ণ মনে ভাবিতে লাগিলাম আচার্য রায় প্রাণপাত করিলেও এ দগ্ধ চায়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি কোথায়? বন্যার মতো সারা দেশ ডুবাইয়া দিয়াছে যেন। সদর রাস্তায়, গলিতে, মাঠে, ঘাটে, গাড়িতে স্টীমারে—যেখানে দেখ এই বিষ। যেদিকেই যাও দুপা অন্তর চায়ের বিজ্ঞাপন। নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সিনেমা দেখিতে আসিলে প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে চা, পর্দার উপর রামায়ণের ছুতা করিয়া তোমার সামনে চায়ের বিজ্ঞাপন হাজির করিল।...আচার্য রায়ই বা কি করিবেন, তাঁহার প্রিয়ছাত্র ভবতোষেরাই বা কি করিবে? বেচারা ভবতোষ অত করিয়া গুছাইয়া আনিল, এক কথায় সব পণ্ড হইয়া গেল!’

সেদিন আর ওকথা লইয়া নাড়াচাড়া করিলাম না, চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম—উৎসাহের দিক দিয়া এই যে লোকসানটা হইল, কি করিয়া আবার এটুকু পূরণ করিয়া লওয়া যায়।

পরের দিন সকালটা একরকম কাটিল, কিন্তু বেশ বুঝা গেল গৃহিনীর উৎসাহে যে রকম ভাঁটা পড়িয়াছে, এইবার কাদা বাহির হইবে এবং সে-কাদা উৎক্ষিপ্ত হইয়া যে আচার্য রায় এবং ভবতোষের অবর্তমানে আমারই অঙ্গে ছিটকাইয়া পড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরের কথা। ভবতোষকে টিপিয়া রাখিয়াছিলাম, সে আসিয়াছে। সিনেমায় আতঙ্ক ধরিয়া গিয়াছে; স্থির হইয়াছে, ঘরোয়া আলাপের মধ্যে দিয়া খুব সূক্ষ্ম ভাবে চা-প্রীতির উপর আঘাত হানিতে হইবে। স্বাস্থ্যতত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে। ভবতোষ হাতে করিয়া একখানা বাংলা মাসিক আনিয়াছিল, আলোচনার মধ্যেই নিরুদ্দেশ ভাবে সেখানার পাতা উল্টাইতেছিলাম। হঠাৎ একটি ছোট্ট প্রবন্ধর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া গেল। তাহার খানিকটা পড়িয়া উৎসাহের সহিত বলিলাম, "সত্যিই স্বাস্থ্যটা যে কি জিনিস, আর সেটা যে কত সাবধান ভাবে রক্ষা করতে হয় এই ছোট্ট আর্টিক্‌ল্‌টাতে দিব্যি লিখেছে; পড়ো না ভবতোষ।"

লেখাটা নির্দেশ করিয়া পত্রিকাটা ভবতোষের পানে বাড়াইয়া দিলাম। ভবতোষ পড়িতে লাগিল—

"বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় সমস্যা কি?—দারিদ্র্য? অনেকে দারিদ্র্য বলিয়াই মনে করেন, বিশেষ করিয়া এই বেকার-বৃদ্ধির যুগে; কিন্তু আরও একটু তলাইয়া দেখিলে বেশ স্পষ্টই বুঝা যায় যে আমাদের এ যুগের যাহা মুখ্য সমস্যা তাহা দারিদ্র্য নয়, পরন্তু স্বাস্থ্য। কেন না আপাতদৃষ্টিতে দারিদ্র্যই তো স্বাস্থ্যহীনতার মূলে। কিন্তু একটু অনুধাবন করিলেই এ ধারণাটা যে ভ্রান্ত তাহা টের পাওয়া যাইবে। স্বাস্থ্যের সঙ্গে দারিদ্র্যের সম্বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু সে সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য নয়, কেন না দরিদ্রও স্বাস্থ্যবান্ হয়; বরং লীগ্ অব নেশান্স-এর

আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য-সমিতির রিপোর্ট এই যে স্ট্যাটিস্টিক্স্ অনুযায়ী ধনী অপেক্ষা দরিদ্রই সাধারণতঃ অধিক স্বাস্থ্যবান্। যদি তাহাই হয় তো তাহার মূল কারণ অন্বেষণ করিয়া দেখা প্রয়োজন। আমরা যে আহার করি তাহার প্রকৃত মূল্য তাহার মহার্ঘতায় নয়—প্রকৃত মূল্য এইখানে যে তাহার মধ্যে আমাদের শরীরের পক্ষে অপরিহার্য বিভিন্ন জাতীয় ভাইটামিন কি পরিমানে বর্তমান। বরং দেখা যায় মূল্যের দিক দিয়া যে জিনিস যত মহার্ঘ ভাইটামিনের দিক দিয়া সে জিনিস ততই হীন। আড়াই টাকা দরের এক সের সন্দেশের সহিত দুই পয়সা চার পয়সা দামের এক সের পালংশাক বা টমেটোর তুলনামূলক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিলেই আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধ হইবে।”

গৃহিনীর পানে চাহিয়া দেখিলাম একবার। মনে হয় যেন ওষুধ ধরিয়াছে; পালংশাকের কথা বলিতে পারি না, তবে টমেটোর প্রশংসায় তাঁহার অম্ললোলুপ রসনা যে সজাগ হইয়া উঠিয়াছে সেটা বেশ বোঝা যায়। ভবতোষ পড়িয়া চলিল, “এখন প্রশ্ন হইতেছে, সব চেয়ে অল্প মূল্যে কি এমন দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে যাহাতে অন্নের মধ্যে সবচেয়ে অধিক ভাইটামিন বা ততোধিক স্বাস্থ্যপ্রদ শক্তি বর্তমান। ভারতের মতো দরিদ্র দেশে এই প্রশ্নের সমাধান সর্বপ্রথমে হওয়া উচিত, কারণ—স্ট্যাটিস্টিক্স্ দেখাইতেছে যে ভারতে মাথাপিছু প্রত্যেক লোকের আয় মাত্র দেড় পয়সা।”

ভবতোষ দম লইবার জন্য একটু থামিল। সকলে বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে প্রবন্ধটা শুনিতেছিলাম। বলিলাম, “মন্দ লেখেনি তো। সত্যি, দেড় পয়সা আয়ের মধ্যেও যদি খানিকটা ভাইটামিনের ব্যবস্থা করতে পারে তো...” ভবতোষ পড়িতে লাগিল,—“আয় মাত্র

দেড় পয়সা। বিজ্ঞানের অধুনাতন সিদ্ধান্ত হইতেছে মাত্র ভারতীয় চা-ই একমাত্র দ্রব্য আছে যাহা দেড় পয়সার বিনিময়েও মানব শরীরের উপযোগী এমন সব পুষ্টিকর...”

আমি প্রায় লাফাইয়া চিৎকার করিয়া উঠিলাম, “অ্যাঁ!—এও যে চায়ের বিজ্ঞাপন দেখছি, ভবতোষ!...ছাড়ো ছাড়ো—মুড়ে ফেলো পত্রিকা!...”

ভবতোষ পত্রিকাটা রাখিয়া দিয়া মগ্নকণ্ঠে বলিল, “তাইতো দেখছি!”

ছেলেমেয়েরা বিস্মিত ভাবে সোরগোল করিয়া উঠিল, “বাবাঃ বাবা, একটুও বুঝতে দেয় নি!”

গৃহিনী শুধু দৃঢ় বিশ্বাসের সংযত কণ্ঠে বলিলেন, “তা হোক, হেঁজিপেঁজি কাগজও নয় এটা। চায়ের যদি কোন গুণ নাই থাকে তো মিছিমিছি ওরা গুণ গাইতে যাবে কেন? সবাই তো আর মিছে কথা বলে আরাম পায় না।”—একবার একটু বক্রভাবে আমাদের উভয়ের দিকে চাহিলেন।

আড়ালে ভবতোষকে বলিলাম, “ওহে, উপায় কি? তোমার বৌদির উৎসাহের বহর তো দেখছই, তার ওপর এ ভাবে চারিদিকেই যদি চুলোর ভারতীয় চায়ের বিজ্ঞাপনের বেড়াজালে ঘিরে রাখে তো কতদিন আর সামলে রাখা যাবে? আর এটা ঠিক জেনো, ও যদি আবার ধরে তো কাউকে আটকে রাখা যাবে না। এমন কি আমারও মনের জোরটা যে টেনে রাখতে পারব একথা বলতে পারি না।... মানে, লগ্ন করে এক যাত্রায় বেরিয়েছি দুজনে—পৃথক ফলও হতে পারে না, পৃথক পানীয়ও হতে পারে না।”—বলিয়া একটু হাস্য করিলাম।

ভবতোষ চিন্তিত ভাবে মাথাটা ধীরে ধীরে নাড়িয়া বলিল, "তাই তো!..."

যাক, দুইটা দিন কাটিয়াছে। আর একটা দিন যদি কোনপ্রকারে কাটাইয়া দিতে পারি তবু যেন কতকটা ভরসা হয়; মেয়েদের মধ্যে একটা সংস্কার আছে তিনটার গাঁট পারাইয়া গেলে জিনিসের একটা স্থায়িত্ব আসে।...অন্ততপক্ষে আমার গৃহিনীর আছেই—বিবাহের তিন বৎসরের মধ্যে আমার একটা ফাঁড়া ছিল, সেটা কাটাইয়া এখন সাতাশ বৎসর চলিতেছে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ওই তিনটা বৎসরের মধ্যে ভালোমন্দ একটা কিছু হইয়া গেলে এই সাতাশটা বৎসর কাটিত না। তিনি তিন সংখ্যাটাকে সেইজন্য একটু সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

সন্ধ্যাটুকু কি করিয়া কাটাইয়া দিব ভাবিতেছি। সিনেমা—অসম্ভব; বেড়াইতে যাওয়া—অসম্ভব—গাছে গাছে চায়ের বিজ্ঞাপন টাঙানো...ফল কিম্বা পুষ্পের লোভে সেদিকে চাহিলে চোখে পড়ে—"শক্তির একমাত্র আধার ভারতীয় চা পান করুন।" হঠাৎ মনে পড়িল চাটুজ্জ্যে পাড়ায় আজ কীর্তন আছে। কলিকাতা হইতে এক নাকি কীর্তনীয়া আসিয়াছে, নূতন এক কি ধরণের কীর্তন করিবে।

পরের দিন সকালেই গিয়া ভবতোষের বাড়ি উপস্থিত হইলাম; কহিলাম, "বলি, ওহে ভবতোষ, তোমার চেষ্টা বুঝি বৃথাই হল! আকাশ বাতাস চায়ে বোঝাই হয়ে গেল, কি করে আত্মরক্ষা করে আর লোকে? কাল তোমার বৌদিকে নিয়ে কীর্তন শুনতে গেলাম হে, ভাবলাম, মনে একটু ধর্মভাব এলে চায়ের কথাটা ভুলে থাকা যাবে'খন—সেখানেও ভারতীয় চা!...শ্রীমতী কৃষ্ণবিরহে দগ্ধ হচ্ছেন, ললিতা বিশাখাকে একটু চা তোয়ের করে আনতে বললেন। বিশাখা

বললেন, 'কিন্তু সখি, একে বিরহের তাপ, তাতে চায়ের তাপ শ্রীমতীর সইবে কি করে?" ললিতা হেসে বললেন, 'বিশাখে, ঐটি তোদের মস্ত বড় ভুল। ভারতীয় চা শুধু শীতের জন্যে নয়, গরমেও পরম উপকারী জিনিস—তা সে উত্তাপ বিরহেরই হোক বা বোশেখ মাসের রোদ্দুরেরই হোক। গরমে চায়ে শরীরের ঘাম ঝরিয়ে দেয়, বিশাখে; তাতে অবিলম্বেই শরীর শীতল হয়ে যায়। আর শীতে আর মিলনে শরীর যখন নিজেই ঠাণ্ডা হয়ে থাকে, তখন তাতে প্রয়োজনীয় উত্তাপ আনতে ভারতীয় চায়ের মতো দ্বিতীয় বস্তুটি যে নেই একথা স্বয়ং ধন্বন্তরী বলে গেছেন।"

ভবতোষ দাঁতে আঙুলের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে খুব মনোযোগের সহিত কথাগুলি শুনিতেছিল, ঈষৎ হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "সত্যি নাকি, শৈলদা?"

বলিলাম, "আরে নিজের কানে শুনে এলাম, আবার জিগ্যেস করে—সত্যি নাকি!...তোমার বৌদিকে তো কোন মতেই আর থামিয়ে রাখা যায় না; বলে 'তোমাতে আর তোমার পেয়ারের ভবতোষে এমন একটা ভালো জিনিস থেকে বঞ্চিত করে রেখেছ—আর আমি কোন মতেই শুনছি নে'...অনেক কষ্টে আজকের দিনটার জন্যে রুখে রেখে তোমার কাছে ছুটে এসেছি।"

ভবতোষ কপালে ধীরে ধীরে আঙুল ঘষিতে ঘষিতে কি ভাবিল, তাহার পর আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "এক মতলব ঠাউরেছি, শৈলদা। ভাবছি, কাল হরিসভার আটচালায় সবাইকে একত্র করে একটা ঝেড়ে লেকচার দোব। এক একজন করে বলার চেয়ে সবাইকে একত্র জড়ো করে বলায় ঢের বেশি ফল হয়; বৌদিটৌদি সবাইকে ডেকে নিয়ে আসবেন আপনি। পাঁচটার সময় সুবিধে হবে

আপনার? আমি তাহ'লে সবাইকে খবর দিই? একটু শুনেই টপ করে যেন চলে আসবেন না, শৈলদা, আগাগোড়া শুনবেন দয়া করে। আর এখানে আমি নেইও বেশিদিন, যে তার কথা;—পরশু সকালেই চলে যেতে হবে আমায়।"

পরদিন বৈকালে হরিসভার আটচালায় বেশ ভিড় জমিয়াছে, সত্যই এতলোক কেন, যদি এর অর্ধেক লোকও চায়ের গালাগালি শুনিতে আসিয়া থাকে তো ভরসার কথা বৈকি।...ভবতোষের সামনে একটা টেবিলে বেশ বড় একটা দেবদারুর বাক্স, তাহার গায়ে লেখা রহিয়াছে "ভারতীয় চা"। শুনিতেছি নাকি লেকচারের পর ভবতোষ চায়ের দাহকার্য সমাধা করিবে।

একটু পরে ভবতোষ উঠিয়া লেকচার দিতে আরম্ভ করিল—"ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ, আজ আমরা এখানে এমন একটি বিষয়ের আলোচনার জন্য সমবেত হয়েছি যার সঙ্গে জীবনের সম্বন্ধ অতি নিগূঢ়। জিনিসটি আর কিছুই নয়, আমাদের নিত্যব্যবহার্য চা। মানব জীবনের সঙ্গে চায়ের সম্বন্ধ আজকের নয়, তাহার প্রমাণ চরকসংহিতায় বহুস্থানে চায়ের উল্লেখ আছে। চা-কে 'কফপিত্তো-বিনাশকো' বলা হয়েছে। চরকের পূর্বে বৈদ্যরাজ হিসাবে আমরা অশ্বিনীকুমার, ধন্বন্তরী, সুষেণ প্রভৃতির সন্ধান পাই। তাঁরা চায়ের গুণপণা অবগত ছিলেন। তাঁরা স্বর্গে চায়ের প্রচলন করেছিলেন। এর নাম নিয়ে সুধীমণ্ডলীর মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন চা-ই অমৃত। এর বিরুদ্ধ মত হচ্ছে—না, অমৃত একরকম সুরা। ভদ্রমহোদয়গণ—আমি এর কোন দিকেই মত দিতে চাই না, কেননা এ সবই পুরাতত্ত্বের বিষয়। তবে এইটুকু না বলে থাকতে পারছি না,

যে অমৃত যদি সুরাই হয় তো স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সব দেবতাকেই আমাদের মাতাল বলে ধরে নিতে হয়, যাতে বোধ হয় কোন হিন্দুই রাজি হবেন না। আমরা পুরাণ প্রভৃতিতে প্রায় পাতায় পাতায় দেখি দেবতাদের অমৃত পান চলছে—কিন্তু কোনখানেই মত্ততা দোষের উল্লেখ নেই। ক্ষণিক অবসাদ এসেছে, কি উগ্ররকম একটা পরিশ্রম করতে হবে—খানিকটা অমৃত পান করে চাঙ্গা হয়ে নিলেন—মিলিয়ে দেখলে বুঝতে পারবেন এটা ঠিক সেই অভিজ্ঞতা যা আপনারা নিত্যই চায়ের মধ্যে দিয়ে পাচ্ছেন।"

শ্রোতারা সব স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে, মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছে, নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। ভবতোষ থামিতে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠিল। সে আবার সুরু করিল—

"কিন্তু যাক্, সেসব ধোঁয়াটে পৌরাণিক কথা ছেড়ে বর্তমান যুগে ফিরে আসা যাক্। আমাদের নিজের জীবনের সঙ্গে চায়ের কি সম্বন্ধ? ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ, এর উত্তর আমি নিজের মুখে দোব না, এর উত্তর আপনাদের নিজের কাছেই রয়েছে। আমারই অনুরোধে আপনারা সকলে আজকের দিন থেকে নিয়ে প্রায় সতের-আঠার দিন পর্যন্ত চা-পান থেকে বিরত আছেন। আপনারা যে কিরকম জীবন্মৃত হয়ে দিনাতিপাত করেছেন তা আর অন্যকে বলে দিতে হবে না। আমায় মার্জনা করবেন, বিচ্ছেদ না হলে কোন জিনিসের আসল কদরটা বোঝা যায় না; সেইজন্যই আমি এই উপায়ে এই কটা দিনের জন্যে আপনাদের সঙ্গে আপনাদের পরম বন্ধু চায়ের বিচ্ছেদ ঘটিয়েছি, ভেতরকার উদ্দেশ্যটা জানতে দিইনি। ভদ্রমহিলা ও ও ভদ্রমহোদয়গণ, আজকাল এহেন চাকে লাঞ্ছনা করা একটা ফ্যাশান হয়ে পড়েছে—প্রায়ই মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ দেখবেন—'চা পান, না

বিষ পান?' 'গুপ্ত শত্রু চা' ইত্যাদি ; কিন্তু সবাই বুকে হাত দিয়ে বলুন তো…"

নিদারুণ বিস্ময়ে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' হইয়া বসিয়াছিলাম। এ যে চরম হইল, যাকে আচার্য রায়ের প্রিয় ছাত্র বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি সেই ভবতোষও শেষকালে মুখোষ-পরা চায়ের বিজ্ঞাপনদাতা!—আবার আচার্যদেবের প্রবন্ধ সব লইয়াই ব্যঙ্গ লাগাইয়াছে!…তাহ'লে সিনেমা, কীর্তন—এসবও ভবতোষের যোগসাজোসে নয়তো?

উঠিয়া পড়িলাম, আরও এক আধজন উঠিল আমার দেখাদেখি, কিন্তু নিতান্ত গোণাগুণতি। সকলেই যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে।

ছেলেটাকে বলিলাম, "যা, ওদের ডেকে নিয়ে আয়, বল্—বাবা বাড়ি যাচ্ছেন, ডাকছেন।"

ছেলে ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, "মা বললেন—যেতে বল্, আমি এখন যাব না'…আমিও মার সঙ্গেই আসব বাবা, তুমি এগোও ততক্ষণ। ভবতোষকাকা কি চমৎকার লোক বাবা!…"

ভবতোষ বলিয়া চলিয়াছে, "…চায়ের মধ্যেও আবার ভারতীয় চা আমাদের পক্ষে বেশি উপযোগী, কেননা তার যা কিছু গুণ তা এই দেশেরই জলবায়ু থেকে। ভারতীয় চা-কে এই হিসেবে ভারতমায়ের মাতৃস্তন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না,—আমাদের রক্তের সঙ্গে, আমাদের দেহের অনুপরমাণুর সঙ্গে…"

একটা গলির মোড় ফেরায় বাকিটা আর শুনিতে পাইলাম না—

ভৈরব

প্রিয়নাথের বয়স যখন বারো কি তের তখন দুর্লভ বাগদির পুত্র ভৈরব ৭।৮ বৎসরের শিশু মাত্র। বয়সের মধ্যে এতটা পার্থক্য থাকায় তাহাকে প্রিয়নাথের বাল্যসখা মোটেই বলা চলে না—সে দরকার পড়িলে ঘুঁড়িটা উড়াইয়া দেওয়া, ডাব পাড়া হইলে কাটারিটা চুরি করিয়া আনা, মাছ ধরিবার জন্য কাঠপিঁপড়ার বাসা খুঁজিয়া ফিরা ইত্যাকার ফরমাইসগুলা খাটিত মাত্র। কাজগুলি সুসম্পন্ন হইলে তাহার বিশেষ কোন পুরস্কার ছিল না; ত্রুটি হইলে কিলটা চড়টা ঘাড় পাতিয়া লইতে হইত। ইহাতেও সে কেন যে ছায়ার মতো তাহার নিত্যসঙ্গী হইয়া থাকিত বলা যায় না।

এ-সব অনেক দিনের কথা; ক্রমে প্রিয়নাথ খেলা ছাড়িয়া সুশীল হইয়াছে, গ্রাম্যস্কুলে পড়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছে এবং পরে কলিকাতা হইতে ডাক্তারি পড়িয়া সম্প্রতি চাকরি লইয়া বিদেশে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

ভৈরবের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। এই যে কতকগুলা বৎসর তাহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে তাহার দাগ, না তাহার রোগপাণ্ডুর দেহে, না তাহার চিরবিষণ্ণ মনে—কোনখানেই অঙ্কিত হয় নাই। প্রিয়নাথ ছুটি পাইলেই আসিত, ভৈরব খবর পাইত; ভালো থাকিলে দেখা করিতে আসিত—অর্থাৎ বাড়ির আশেপাশে ঘুরিয়া নজরে পড়িবার চেষ্টা করিয়া ফিরিত; অসুখে পড়িয়া থাকিলে এটুকুও অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিত না—অদর্শনের ব্যথাটা বুকে চাপিয়া পড়িয়া

থাকিত ; 'বামুনদাদা' তো আর বাড়ি আসিয়া দেখা দিয়া যাইতে পারে না।

দেখা হইলে, প্রিয়নাথের মনটা যদি প্রসন্ন থাকিত, সে মুরুব্বির মতো দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করিত, নচেৎ শুধু 'কি রে, ভৈরবে নাকি ?'—বলিয়াই ক্ষান্ত হইত। ভৈরব যে ইহাতেই পরিতৃপ্ত হইত এরূপ বলা যায় না, তবে ইহার বেশি পাইবার উচ্চাশাও তাহার মনে ছিল না।

বামুনদাদার ডাক্তার হইবার খবর যখন তাহার কাছে প্রথম পৌঁছিল, ভৈরব তখন পীড়িত, তবুও অনির্বচনীয় এক হৃদয়াবেগের বশে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া সে তাহার বাড়ি যাইয়া উপস্থিত হইল। কোট-প্যাণ্ট পরিয়া ঔষধের বাক্স হাতে তাহাকে কেমন দেখায় তাহা দেখিতে হইবে তো ?—ক্ষণমাত্র বিলম্ব করা আর চলে না। প্রিয়নাথ ইহার পূর্বেই চাকরি-স্থানে চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং হতাশ হইয়া ভৈরবকে ফিরিয়া আসিতে হইল। জ্বরটা ২।৩ দিন একটু প্রবল হইল।

নূতন বাসার জন্য কয়েকটা জিনিসপত্র লইতে প্রিয়নাথ বাড়ি আসিল। ভৈরবের মা আসিয়া জানাইল ভৈরবের অসুখটা একটু বাড়িয়াছে, আর সে প্রিয়নাথ ভিন্ন কাহারও কাছে চিকিৎসা করাইতে নারাজ।

নূতন ডাক্তার ইহাতে একটু গর্ব অনুভব করিল। হাতে কাজ না থাকিলেও বৈকালের পূর্বে তাহার অবসর হইয়া উঠিল না। নূতন-কেনা সুট পরিয়া পকেটে অর্ধেক বাহির করা স্টেথোস্কোপ ও হাতে একটা ব্যাগ লইয়া যখন সে ভৈরবের কুটীরে উপস্থিত হইল, ভৈরব বিছানা হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া ঢিপ্ করিয়া একটা প্রণাম করিল।

গম্ভীরভাবে রোগীটিকে নাড়াচাড়া করিয়া প্রিয়নাথ তাহার হাঁস্‌পাতালের একটা ফরম্‌ বাহির করিয়া তাহাতে রোগীর নাম, ঔষধ ও তাহার সেবনবিধি ও অবশেষে নিজের দস্তখৎটি পর্যন্ত যথাপদ্ধতি লিখিল, পথ্যনির্ণয় করিয়া দিল এবং রোগীর ঘরটির সমস্ত দোষগুলি নির্দেশ করিয়া ও আদর্শ রোগীনিবাস সম্বন্ধে খানিকটা উপদেশ দিয়া চলিয়া গেল।

সেই সময় পরীক্ষা করিলে জানা যাইত ভৈরবের জ্বর এইটুকু সময়ের মধ্যেই অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। সে মাকে বলিল, "হ্যাদা, বামুনদা ডাক্তার হওয়ায় যেন বাঁচা গেল, না ?"

কর্মস্থানে যাইবার পূর্বে প্রিয়নাথ আর-একবার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভৈরবকে দেখিতে আসিয়াছিল এবং নিজের ডাক্তারির আশুফলকারিতা দেখিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিয়াছিল, "এই সামান্য জ্বরে ভৈরবে এতটা দিন ভুগলে! কে দেখছিল দুলে-বউ ?"

তাহার এই আত্মপ্রসাদে সাহস পাইয়া ভৈরব তাহার বহুদিনের পোষিত একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তোমার চাকরির জায়গায় আমায় নিয়ে যাবে, বামুনদা ?"

জবাব পাইয়াছিল, "একটু রোস, সেখানে জমিয়ে বসি আগে।"

যাইবার দিন স্টেশনে প্রিয়নাথ দু'একবার ভৈরবকে দেখিতে পাইল—যেন একটু গা ঢাকা দিয়া বেড়াইতেছে। বিশেষ তাড়াতাড়ি বলিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

গন্তব্য স্টেশনে নামিয়া প্রিয়নাথ কুলি ডাকিতেছে, এমন সময় পিছন হইতে ভৈরব আসিয়া ট্রাঙ্ক্‌টার নিকট হেঁটমুখে দাঁড়াইল, বলিল, "কুলি আর ডাক্‌তে হবে না, বামুনদা।"

প্রিয়নাথ একেবারে থ হইয়া গেল; জিজ্ঞাসা করিল, "তুই এখানে?"

ভৈরব শুধু স্নেহাবেগের টানে ঘুরিতেছে, তাহার একটা অলীক জবাব গড়িয়া রাখা হয় নাই। কিছু উত্তর দিতে পারিল না, মূঢ়ের মতো নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রিয়নাথ আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে ভৈরবে?"

ভৈরব একবার চক্ষু তুলিয়া কাতরভাবে বলিল, "তুমি একলা রয়েছ, বামুনদা, বিদেশ বিভুঁই—"

প্রিয়নাথ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "তাই বুঝি তুই আগলাতে এসেছিস্?—মস্তবড় পালোয়ান! এখন নে, তোল্; পরের কথা পরে হবে। তোর মাকে বলে এসেছিস্ তো? তোর কোন গুণে ঘাট নেই।"

ভৈরব কিছু উত্তর দিল না, ট্রাঙ্কটা তুলিয়া লইল।

দুই জনে বাসার দিকে চলিল।

পৌছিয়া বোঝামাথায় উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ভৈরব একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—গতিক দেখিয়া বেশ উৎসাহ বোধ হইল না। দেওয়াল দিয়া ঘেরা প্রকাণ্ড হাতার মধ্যে হাঁসপাতাল ও কয়েকখানা বাসাবাড়ি, সযত্নরক্ষিত ফুলের বাগান ও দুইটা কুয়া। তীরভাঙা নদী, বড় বড় পুকুর, আগাছায় ভরা বড় বড় বাগান প্রভৃতি সব ক্ষেত্রে যে-ভৈরব প্রিয়নাথের দক্ষিণ হস্ত ছিল, এখানে তাহার যেন কোন কাজ নাই বলিয়া বোধ হইল। এই নূতন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তাহার প্রথম মনে হইল—বামুনদাদা ও তাহার মধ্যে অনেকটা ব্যবধান আসিয়া পড়িয়াছে।

এই সময় ময়লা-কাপড়-পরা একটা হিন্দুস্থানী চাকর আসিয়া তাহার মাথা হইতে ট্রাঙ্ক্‌টা নামাইয়া বাড়ির ভিতর লইয়া গেল।

ভৈরবের চক্ষের সামনে হইতে ঝাঁ করিয়া আর-একটা পর্দা সরিয়া গেল—ওঃ, সে যে বাগদি, অস্পৃশ্য; বাড়ির বারান্দায় উঠিবার তাহার অধিকার নাই যে! আসিবার সময় এই কথাগুলা সে ভুলিল কিরূপে?

প্রিয়নাথ জামা জুতা ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। ভৈরবকে মৌনভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, "ওপরে উঠে আয়না রে, এখানে অত বিচার নেই।"

ভৈরবের মনটা একটু হাল্‌কা হইল বটে; কিন্তু জাতিগত সংস্কার ঠেলিয়া আর সে-সময় সে দাওয়ায় উঠিতে পারিল না। প্রিয়নাথের এই কথাটুকুতে বেশ পরিতৃপ্ত হইয়া সিঁড়ির নিচে বসিয়া এ-কথা সে-কথার পর, তাহার বামুনদাদার সেপাই হইবার বহুদিন-পোষিত ইচ্ছা ও বর্তমানে কত বাধা এড়াইয়া এখানে ভালোয় ভালোয় আসিয়া পৌছান প্রভৃতি বিষয় লইয়া সে গল্প জুড়িয়া দিল।

হাজরি দিবার জন্য প্রিয়নাথ হাঁসপাতালে চলিয়া গেলে ভৈরব হিন্দুস্থানী চাকরটার সহিত বাংলাভাষায় বলিয়া ও হিন্দি ভাষায় শুনিয়া যতটা ধৈর্য রহিল গল্প করিল এবং তাহার পর বেলা বাড়িয়া যাওয়াতে ও মার কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় মৌন হইয়া বসিয়া রহিল।

প্রিয়নাথ বাড়ি আসিয়া ভৈরবকে সেই একইভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া একটু রাগিয়া বলিল, "হয়েছে! তোর নিজের শরীরেরই খবর নেই, তুই আবার আমায় আগ্‌লাবি! এতক্ষণ নেয়ে ধুয়ে নিতে পার্‌তিস্ নি?"

দাওয়ার এককোণে একটা ছোট কামরার তালা খুলিয়া দিয়া প্রিয়নাথ কহিল, "নে উঠে আয়, এই ঘরটাতে থাকবি তুই।"

চাকরটার দিকে একবার চাহিয়া সংকোচ-পীড়িত পদক্ষেপে ভৈরব ঘরটাতে প্রবেশ করিল। প্রিয়নাথ চাপা গলায় বলিয়া দিল, "খবরদার, ও-বেটাকে বলিস নি যেন যে তোর ঘরে দোরে ঢোকা মানা।"

মর্মস্থলে আহত হইয়া—কি-একরকম হইয়া গিয়া ভৈরব বলিল, "ও জানে।"

ভৈরব যে তাহার অনুমতির বিরুদ্ধেও আসিয়াছে প্রিয়নাথ ইহার জন্য তাহাকে কিছু বলিল না। দূরবিদেশে অবসর সময়ে দু'টো কথা কহিবার লোক জুটিল, ইহাতে সে বেশ নিশ্চিন্ত হইল। পূর্বেই ভাবিয়াছিল একটু পসার জমাইয়া বসিতে পারিলে ভৈরবে কি অন্য কাহাকেও তাহার পেয়াদা করিয়া কেতাদুরস্তভাবে থাকিবে। এখন ভাবিল—এই ঠিক হইয়াছে; ডাক্তার, উকিল প্রভৃতির কায়দাটাই আগে, না হইলে পসার জমে না।

সমস্ত দিন উর্দি-চাপরাস্ জড়াইয়া বসিয়া থাকিলেও ভৈরবকে কাজ বেশি করিতে হইত না। প্রিয়নাথের সহিত যথাসময়ে আফিসে যাইত, ঘরের চৌকাঠে ঠেস দিয়া বসিয়া বসিয়া ঝিমাইত—এবং কালে ভদ্রে প্রিয়নাথের দু'একটা ডাক পড়িলে বিশেষ উৎসাহের সহিত ব্যাগটা হাতে করিয়া ও ছাতাটা ডাক্তারবাবুর মাথায় ধরিয়া নিজে চাকরির ও ফলতঃ নিজের জীবনটার সফলতা অনুভব করিত। সেরূপ দিনগুলা তাহার দেমাকে কাটিত।

কয়েকটা মাস এইরূপে কাটিল। ইহার মধ্যে প্রিয়নাথ একবার ছুটি লইয়া দেশে আসিয়াছিল। তাহাতে ভৈরবের গ্রাম-সমক্ষে নিজের পদগৌরব ও রোগমুক্ত সবল সুস্থ দেহটা দেখাইবার অনেক দিনের সাধটা পূর্ণ হইয়াছিল। ফিরিবার সময় বিষয়-সম্পর্কে তাহার কিছু বিলম্ব হওয়ায় প্রিয়নাথ একলাই ফিরিয়াছিল।

মাস খানেক পরে ভৈরব যখন ফিরিল, দেখিল তাহার কর্তব্যের একটু বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রতি দুই তিন দিন অন্তর তাহাকে সদরে যাইতে হইবে। সিভিল্ সার্জেন মিস্টার রয়ের বাংলাতে যাইয়া তাঁহাকে প্রিয়নাথের সেলাম দিতে হইবে এবং মিস্ রয়ের নিকট ফুলের তোড়া পৌছাইতে হইবে। রবিবারে রবিবারে প্রিয়নাথ স্বয়ংই হাজরি দেয় এবং সমস্ত সপ্তাহ ধরিয়া এই দিনটির জন্য বিশেষ আয়োজন চলিতে থাকে। রয় পরিবার ক্রিশ্চান।

ভৈরব আন্দাজে আব্ছাওয়া আব্ছাওয়া যাহা একটু বুঝিল, চাকর-খানসামার সঙ্গে মিশিয়া তাহা বেশ সুস্পষ্ট করিয়া লইল। প্রথম একটা তীব্র চোট খাইল; এবারে বাড়িতে বিবাহের কথা উঠিলে প্রিয়নাথ গুছাইয়া লইবার অছিলায় তাহা স্থগিত রাখিয়া আসিয়াছে, আর এখানে এই বিজাতীয় ব্যাপার! একেবারে ক্রিশ্চানের সহিত বিবাহ! মাথাভার, বুকব্যথা প্রভৃতির ভাণ করিয়া সে তিন চার দিন ফুল পৌছান বন্ধ দিল, কিন্তু দেখিল যে এরূপ করায় সে যাহা ভোগ করিতেছে তদপেক্ষা চতুর্গুণ যন্ত্রণায় বামুনদা অস্থির হইয়া পড়ে। সমস্ত দিনে আহার একরূপ করেই না, কল আসিলে বাবুর অসুখ বলিয়া ফিরাইয়া দিবার আদেশ ভৈরবের উপর থাকে; শুধু মিস্ সাহেবের জন্য কেনা পুষ্পরাশি ও মিস্-সাহেব-প্রদত্ত কুকুরটার সহিত সমস্ত দিনটা কাটাইয়া দেয়।

ভৈরব ধর্ম ও সমাজের দিক দিয়া ব্যাপারটা যতই গর্হিত মনে করুক, বামুনদাদার মলিন মুখ দেখা তাহার অসহ্য হইয়া পড়ায় তিন চার দিন বাদে আর অনিচ্ছার কোন লক্ষণই প্রকাশ করিল না, পরন্তু পরম আগ্রহসহকারেই এই পুষ্প-উপহার পৌছাইবার কর্তব্যটা নিজের হাতে উঠাইয়া লইল।

ক্রমে তাহার সংস্কার-জাত বিদ্বেষটাও তিরোহিত হইয়া গেল। ডাক্তার-দাদার প্রেমের পাত্রীর উপর তাহার একটা সহজ সরল ভক্তি ও আত্মীয়তা দিন দিন পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার বৈচিত্র্যহীন জীবনে একজনকে মাত্র সে ভালোবাসিয়াছিল—সে প্রিয়নাথ; এখন তাহার অজ্ঞাতসারে সেই প্রেমপ্রবাহিণীর আর-একটি ধারা এই নারীটির চরণ-প্রান্তে আসিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

প্রিয়নাথের প্রণয়-ব্যাপারটা যতই ঘোরাল হইয়া আসিতেছিল, স্বদেশবাসী, অল্পভাষী এই ভৃত্য-অভিভাবকটির নিকট প্রিয়নাথ ততই যেন সংকুচিত হইয়া আসিতেছিল। ভৈরব একটু-আধটু লিখিতে পড়িতে পারিত; কিন্তু সে যে এই কথাটা চিঠির সাহায্যে বাড়ি পৌছিয়া দিবে এরূপ কোন ভয় প্রিয়নাথের ছিল না, ভয় ছিল তাহার ব্যক্তিত্বকে। মুখে রা নাই, অসীম বাধ্যতার সহিত সমস্ত আদেশ নির্বিচারে পালন করে, অথচ প্রিয়নাথের তাহাকে লইয়া একটা দুর্বহ অস্বস্তিতে থাকিতে হইত; তাহার নিকট নিজের প্রত্যেক গতিবিধির একটা যুক্তি দেখান প্রয়োজন বলিয়া বোধ হইত। সেইজন্যই একদিন থাকিয়া থাকিয়া অহেতুক ভাবে প্রিয়নাথ বলিয়া উঠিল, "দেখ্ ভৈরবে, ব্রাহ্ম কাদের বলে জানিস্?"

ভৈরব বলিল, "না, বামুনদাদা।"

"তারা আসলে হিন্দু; তবে মেয়েপুরুষে লেখাপড়া জানে, আর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, তাই ক্রিশ্চান বলে বোধ হয়।" তাহার পর একটু থামিয়া বলিল, "যেমন এই মিস্ রয়রা।"

ভৈরব চুপ করিয়া রহিল; বুঝিতে পারিল না এই মিথ্যাটুকু বলিবার উদ্দেশ্য কি।

পূর্বরাগের ব্যাপারটা বেশ জমিয়া আসিতে লাগিল। এক রবিবার

সন্ধ্যায় প্রিয়নাথ খুব উৎফুল্লভাবে মিস্টার রয়ের বাড়ি হইতে ফিরিল, মিস্ রয়ের কুকুর-বাচ্চাটাকে সাধারণ পাওনার ঢের বেশি আদর করিল এবং সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পর উঠানে আরাম-কেদারায় শুইয়া ভৈরবকে বুঝাইতে লাগিল—এখানকার পাশকরা বিদ্যা লইয়া পঞ্চাশ টাকায় পড়িয়া থাকা কতটা মূর্খতা এবং বিলাতে গিয়া একটা বিশিষ্ট ডাক্তার হইবার সুবিধা পাইলে তাহা জাতিধর্মের খেয়ালে ত্যাগ না করা কতটা সুবুদ্ধির পরিচায়ক।

এইরূপ অনেক কথা সে বলিয়া যাইতে লাগিল। সে যে-একটা মদির স্বপ্নে আবিষ্ট হইয়া আছে তাহার একটা অচেষ্টাপ্রসূত বর্ণনা তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। আরাম-কেদারায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে এলাইয়া দিয়া সে বৈশাখী চন্দ্রের দিকে চাহিয়া আছে, ভৈরব তাহার পা টিপিয়া দিতেছে আর নিবিষ্টমনে শুনিয়া যাইতেছে—অসংখ্য আলোকমালায় শোভিত ইন্দ্রালয়তুল্য বিলাত যাইবার জাহাজটা কি বস্তু, আর বিশাল সমুদ্রের নীলাম্বুরাশি ঠেলিয়া এই জাহাজ যে-বিলাতে প্রিয়নাথকে উত্তীর্ণ করিবে তাহাই বা কি অপরূপ! তাহার পর যখন প্রিয়নাথ কপালে যশের টীকা পরিয়া ফিরিয়া আসিবে এবং চিরবাঞ্ছিতা রয়-দুহিতার সহিত মিলিত হইয়া সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইবে, সে মুহূর্তই বা কি মহিমাময়! যে-ভৈরব ডাক্তার-দাদার মধ্যে নিজের সত্তা লুপ্ত করিয়া দিয়াছে সে প্রভুর এই বিপুল সার্থকতার বাহিরে নিজেকে কোনখানে দেখিতে পাইল না।

তাহার মনে সামান্যও দ্বিধা আপত্তি কি নিয়মলঙ্ঘনের ব্যথা উদয় হইল না; স্নুধু মনের মধ্যে তাহার একটি ছবি স্পষ্ট হইয়া উঠিল—সৌভাগ্যের আসনে সস্ত্রীক আনন্দমূর্তি ডাক্তার-দাদা আর পদতলে আপন-ভোলা সে স্বয়ং।

সকালের রীতি অনুযায়ী ভৈরব ডাক্তারখানায় ঘরের দুয়ারে বসিয়া ছিল ; প্রিয়নাথ ডাক্তারি পড়িতে যাইবার গল্প করিতেছিল। একটা রোগীকে প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌ দিয়া প্রিয়নাথ বলিল, "তা হ'লে ভৈরবে, আমি তো এই দুমাস বাদে রওনা হলুম, তুই আর মায়া বাড়িয়ে কি করছিস্ ? আর কি জানিস ভৈরবে, ওদের এ সময় একটু মন যুগিয়ে চলাই ভালো, আমি ভাবছি এই সময় একটা ক্রিশ্চান 'বয়' রাখব, দুটো লোক রাখবার তো আর আমার অবস্থা নয়…"

কথাটা ভৈরবকে শেলের মতো বিদ্ধ করিল। তাহার মনটা ইদানীন্তন নূতন অবস্থার মধ্যে নিজকে মানাইয়া লইয়া আসিতেছিল ; কিন্তু তাহা আর এই নূতনতর আঘাত সহ্য করিতে পারিল না, ভাঙিয়া পড়িল।

প্রিয়নাথ তাহার পানে দৃষ্টিপাত করিল এবং বোধ করি একটু ব্যথিতও হইল। ভাবের আবেগে বলিতে লাগিল, "দেখ্, অদ্ভুত তোদের এই হিন্দুধর্ম, প্রাণের টানকে একেবারে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। এই দেখ্ না, তুই আমায় এত ভালোবাসিস্, অথচ সর্বদাই দূরে দূরে থাক্‌তে হয়—এটা ছুঁতে পাবে না, ওখানটা মাড়াতে পাবে না—ছোট ঘরে জন্মেছিস্ বলে আর দোষের সীমা নেই। মিস্ রয়দের ধর্ম দেখ্ দিকিন্,—কি ছোট কি বড়, সকলকে ভাই ভাই করে রেখেছে ! সত্যি বলতে কি ভৈরবে, আমি যে ক্রিশ্চান হ'তে যাচ্ছি তাতে আমার মোটেই আপশোষ নেই, বরঞ্চ তুইও যদি হতিস্ তো বুঝতে পারতিস্ ডাক্তার-দাদা তোর কত আপন হয়ে পড়ে। আর মিস্ রয়ও ক্রিশ্চানের বড় পক্ষপাতী ; আমি যদ্দিন বিলেতে থাকব চাইকি তোকে তাঁদের …"

হঠাৎ চাহিয়া দেখিল ভৈরবের চক্ষু দুইটা ছলছল করিতেছে।

প্রিয়নাথ একটু অপ্রতিভ হইয়া গেল। হাসিয়া বলিল, "তোকে কি আমি ক্রিশ্চান হ'তে মাথার দিব্যি দিচ্ছি, যে কাঁদ-কাঁদ হয়ে উঠলি? তবে আমি যে শীগ্‌গিরই হ'তে যাচ্ছি এটা ঠিক, না হ'লে কি বুড়ো আঙুলে পইতে জড়িয়ে মন্ত্র আউড়ে মিস্ রয়কে বে কবব?—হ্যাঁরে ভৈরবে?"

এটুকুতে কিন্তু ভৈরবের মনটাকে শান্ত করিতে পারিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল প্রিয়নাথ যেন তাহাকে দলে টানিবার চেষ্টা করিতেছে এবং এই কথাটাই আজ কয়েকদিন ধরিয়া নানাভাবে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। মনটা তাহার ভীত, সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িল; এবং এই সন্দেহ ও জাতিচ্যুতির ভয় এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে আর মনটাকে মানান তাহার অসম্ভব হইয়া উঠিল। বামুনদাদার প্রতি ভক্তি, প্রেম, বিশ্বাস সমস্তই এক মুহূর্তে রূপান্তরিত হইয়া এক দারুণ অবিশ্বাস, বিতৃষ্ণায় পরিণত হইয়া গেল। ভৈরবের মনে হইতে লাগিল যে এ স্থানটাতে নিশ্বাস-বায়ুর অভাব ঘটিতেছে।

ভৈরব দুই দিন অন্যমনস্কভাবে পাগলের মতো কাটাইল। তৃতীয় দিন রবিবার ছিল; প্রিয়নাথ সকালে উঠিয়া দেখিল ঘরটা শূন্য পড়িয়া আছে—ভৈরবে নাই।

প্রিয়নাথের অন্তরে একটু আঘাত লাগিল; কিন্তু সেদিন রবিবার—মিলন-আশার আনন্দ লইয়াই সে উঠিয়াছিল, এই ক্ষুদ্র বিচ্ছেদটির দিকে তেমন মন গেল না।

ভৈরবের অন্তরে অন্তরে একটা ঝড় বহিতেছিল, তাহাই যেন ধাক্কা দিয়া তাহাকে লইয়া চলিল। সে স্টেশনের অভিমুখে চলিল, পৌঁছিয়া একটা মালের-বস্তার উপর অন্যমনস্কভাবে বসিয়া রহিল। যখন গাড়ি

আসিল তখন একটা কামরায় উঠিয়া বসিল—টিকিট করিবার কথাটা তাহার মনেও পড়িল না। গাড়ি চলিতে লাগিল।

কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ কানের কাছে ঠক্‌ঠক্ শব্দে জাগিয়া উঠিল—

"টিকিট, টিকিট ?"

ভৈরব পকেটে হাত দিতে যাইতেছিল, হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল টিকিট কেনা হয় নাই; টিকিট-চেকারের মুখের পানে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

বেশি কথা জিজ্ঞাসা করিবার সময় ছিল না, টিকিট-চেকার দরজা খুলিয়া ভৈরবকে নিচে নামাইয়া লইয়া স্টেশনের টিকিট-কালেক্টারের সোপর্দ করিয়া গাড়িতে গিয়া উঠিল।

পরমুহূর্তে গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

আবার প্রশ্ন লইল, "টিকিট ?"

ভৈরব উত্তর দিল, "ভুলে গেছি।"

"ভাড়া দাও।"

"কত ?"

টিকিট-কালেক্টার একবার চকিতে এদিক-ওদিক দেখিয়া লইল, বলিল, "কোথা থেকে আস্‌ছিস্ ?—তা যেখান থেকেই আসিস্ জংশন থেকে চার্জ হবে, রাখ্ দুটো টাকা।"

টাকা বাহির করিতে ভৈরব পকেটে হাত দিল; হাতটা পকেটের মধ্য দিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল।

ভৈরব কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। আদায় হওয়ার কোন আশা নাই দেখিয়া চাপা গলার বদলে টিকিট-কালেক্টার খোলাখুলি ভাবেই হুমকি আরম্ভ করিয়া দিল, পুলিশের

হাতে দিবার ভয় দেখাইয়া বেশ খানিকটা হৈ-চৈ সৃষ্টি করিল।

একটু জনতা হইয়া পড়িল, একজন পাদ্রি সাহেব গাড়ি হইতে নামিয়াছিল, ভিড়ের মধ্যে আসিয়া প্রশ্ন করিল, "কি হয়েছে বাবু? টিকিট কিনে নাই বুঝি?" সঙ্গে সঙ্গে ভৈরবের কর্তিত পকেটের ভিতর সংবদ্ধ হাতখানা দেখিয়া ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইল, এবং জিজ্ঞাসা করিল, "কত চাহি, ইহার তো পকেট কাটা পড়িয়াছে।"

টিকিট-কালেক্টার আড়ে চাহিয়া একটু রসিকতা করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, এবার এও কাটা পড়বে, তুমি বাঁচাচ্ছ নাকি? তাহ'লে রাখো দুটো টাকা।"

পাদ্রি-সাহেব পকেট হইতে দুইটা টাকা বাহির করিল। টিকিট-কালেক্টার একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল। কিছু না বলিয়া পকেট হইতে একটা রসিদ-বহি বাহির করিল, একটা রসিদ লিখিল, তাহার পর সাহেবের একটা টাকা টানিয়া লইয়া ও রসিদটা ছিঁড়িয়া দিয়া রাগত-ভাবে গট্ গট্ করিয়া চলিয়া গেল।

পাদ্রি-সাহেব ভৈরবকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি করিয়া টাকো?"

ভৈরব বাক্যটার অর্থগ্রহণ করিতে না পারিয়া পাদ্রির মুখের পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

একজন ভদ্রলোক বলিল, "কি করিস্ রে ব্যাটা, বল্‌না তাই।"

ভৈরব বলিল, "কিছুই করি না এখন।"

সাহেব প্রশ্ন করিল, "আমার চাপরাশি হইবে?"

ভৈরব ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

সাহেব হস্তস্থিত একটা ভারি ব্যাগ্ বাড়াইয়া ধরিল। ভৈরব উঠিল এবং সেইটা হাতে লইয়া সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

সাহেবের চাপরাশি হইয়া সে সাহেবের কাছে রহিল। কাজ এমন কিছু বেশি নয়—ভৈরব প্রায় বসিয়াই থাকিত। এই বসিয়া থাকাই কিন্তু তাহার জীবনকে দুর্বহ করিয়া তুলিল। প্রিয়নাথ ও তাহার মধ্যে ব্যবধানটা যেমন বর্ধিত হইয়া পড়িল, তাহার অন্তরটা টানের বেদনায় ততই টন্‌টন্ করিতে লাগিল। বসিয়া বসিয়া ভাবিবার যথেষ্ট সময় পায়—সেই সময়টাতে ঐ একটি মাত্র চিন্তাকে পুষ্ট করে। যেটুকু সময় সে কর্মে লিপ্ত থাকে সেটুকুও বড় অন্যমনস্ক হইতে পারে না। মনে হয় ডাক্তার-দাদায় সমর্পিত তাহার জীবনের বাঁধা কর্মে পাদ্রি-সাহেবের কাজগুলা কেবলই অনধিকার প্রবেশ করিতেছে; সকালে বিকালে সন্ধ্যায় একটা ফরমাস তামিল করিতে গেলেই মনে পড়িয়া যায় এ-সময় ডাক্তার-দাদার জন্য কি কাজ করিতে হইত।

পাদ্রি-সাহেব সন্ধ্যার সময় ভৈরবকে লইয়া একটু বসিত। প্রথম প্রথম প্রসঙ্গক্রমে যিশুর কথা আনিয়া ফেলিতে লাগিল, ক্রমে অপ্রাসঙ্গিকভাবে বাইবেল আওড়ানো সুরু করিয়া দিল। ভৈরবের মনটা সাহেবের গল্পে কতটা সংবদ্ধ থাকিত বলা যায় না; কারণ মাস দেড়েক পরে একদিন জমাট গল্পের মাঝেই সে হঠাৎ বলিয়া বসিল, "বাবা, আমার আর মন লাগছে না, ভাবছি যাব।"

পাদ্রি-সাহেব বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোটায়?"

ভৈরব বলিল, "আমার মনিবের কাছে, ডাক্তার-দাদার কাছে।"

পাদ্রি বলিল, "যাইবে যাও, আমি ভয় করি না; সুডু টোমার জন্য ভাবি—সে টোমায় আর স্টান ডেবে?"

"সে আমি ঠিক করেছি। ডাক্তার-দাদা এদ্দিন ক্রীশ্চান হয়েছে নিশ্চয়; আর চার পাঁচ দিনের মধ্যেই বিলেত যাবে। তাকে একবার দেখিগে; যদ্দিন না ফিরে আসেন, রয়-সাহেবদের বাড়ি থাকবো'খন,

বাবা। আমায়ও তুমি মন্তর পড়িয়ে নেও—আর তুচ্ছু ধর্মের জন্যে ডাক্তারদাকে ছেড়ে থাকতে পারিনে; ডাক্তারদা ভিন্ন আমার আর এ সংসারে কেউ নেই, বাবা—"

পাদ্রি-সাহেবের পা জড়াইয়া ভৈরব হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

*　　　*　　　*　　　*

তিন দিন পরের কথা।

সন্ধ্যা হব-হব। কাজকর্ম সারিয়া প্রিয়নাথ বাড়ির সামনে ঘাসের উপর আরাম-কেদারায় দেহ ছড়াইয়া শ্যামাবিষয়ক এক গান লইয়া গুন্‌গুন্ করিতেছিল।

পাদ্রির দেওয়া ঢিলা-ঢালা কোট-প্যাণ্টালুন পরিয়া ভৈরব সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রিয়নাথ প্রথমটা তাহাকে চিনিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিল, "কে ?"

ভৈরব কাঁদিতেছিল, ভাঙা গলায় উত্তর করিল, "আমি, ডাক্তারদা, আবার ফিরে এসেছি।"

বিস্মিতভাবে প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করিল, "তা তো বুঝলাম, কিন্তু এ-বেশ কেন ?"

ভৈরবের বুকটা একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় ধক্‌ধক্ করিতে লাগিল। প্রিয়নাথের মুখের উপর কোটরগত বড় বড় চক্ষু দু'টা রাখিয়া প্রশ্ন করিল, "মিস্ রয়ের সঙ্গে বে—হয়ে তোমার বিলেত যাওয়ার কি হ'ল, ডাক্তারদা ?"

প্রিয়নাথ তাচ্ছিল্যের সহিত বলিয়া যাইতে লাগিল, "আরে মারো ঝাড়ু, ওসব দিকে আবার মানুষে যায়! আর ঐ ক্রিশ্চানগুলোর নাম সন্ধের সময় মুখে আনিস নি, না কথার ঠিক আছে, বা ধর্মের ঠিক

আছে—আর ধর্মের ঠিক থাকবে কি? ওটা কি একটা ধর্ম?—খেয়ালের মাথায় কি ভয়ানক ব্যাপারটাই করে বসেছিলাম একটু হলে! নে, তুই ওই বাদুরে পোষাক ছাড়্, সব বলছি পরে, দুচক্ষের বিষ ওগুলো...”

অবসন্নভাবে ভৈরব বসিয়া পড়িল, মৃতের মতো ভাবলেশহীন নয়নে চাহিয়া বলিল, “আমি যে সব খুয়ে এসেছি, ডাক্তারদা; যেখানে একটু জায়গা পাবার জন্যে সব দিলুম সেখানেও যে আমার দোর বন্ধ হয়ে গেল...”

[প্রবাসীর দ্বিতীয় শ্রেণীর পুরস্কার-প্রাপ্ত গল্প]

[প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩০]

অথৈ

জায়গাটার আর নাম করিব না, মানুষটির তো নয়-ই। কাহিনীটি বলার সুবিধার জন্য একটা মনগড়া নাম দিয়া দিলাম—ধরুন অনন্তবাবু।

কলিকাতার কাছাকাছি একটা মহকুমা, অনন্তবাবু সেখানকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, থাকেন সেখানেই, বিশেষ একটা কাজে শনিবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, আজ সোমবার ফিরিয়া যাইতেছেন, পৌঁছিয়াই আফিস করিতে হইবে। সে জন্যও তাড়া আছে, তাহা ভিন্ন কলিকাতায় এক মুহূর্তও থাকিতে আর সাহস হয় না। বোমা পড়িতেছে, যে কোন মুহূর্তেই যে কোনখানে পড়িতে পারে। সমস্ত কলিকাতায় পালাই পালাই রব উঠিয়া গেছে, ট্রাম বাসে অকথ্য ভিড়। শুনিয়াছিলেন এখন এই অবস্থা যাইতেছে, কলিকাতায় আর ভদ্রলোকে আসে না, তবে দরকারটা নাকি নিতান্তই গুরুতর ছিল, না আসিয়া উপায় ছিল না। তবু অবস্থা যে এত খারাপ কল্পনা করিতে পারেন নাই। মাস-দেড়েক আগে আসিয়াছিলেন, তখনও ভদ্রলোকের বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে কলিকাতা, তবে এ-কলিকাতার কাছে সোনার চাঁদ।

সিনিয়ার ডেপুটি, পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স হইয়াছে, এস্-ডি-ও'র পদে রহিয়াছেন। ডেপুটি বলিতে সাধারণতঃ যে রকম বোঝা যায়—ফিট্‌ফাট, চট্‌পটে, চোখে মুখে কথা ফুটিতেছে, সে ধরণের নয়। থলথলে মোটা, বড় বড় কাঁচা পাকা গোঁফ চিবুকের অর্ধেকটা পর্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। ঝলঝলে প্যাণ্টের উপর ঝলঝলে চীনা কোট, মাথায় সমান করিয়া ছাঁটা চুল। অত্যন্ত ধর্ম-ভীরু মানুষ, তাহার উপর আইন ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া পদে পদেই কেমন যেন থমকিয়া

দাঁড়াইবার একটা অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে। একটু এদিক ওদিক হইলেই মাথাটা ঝুঁকাইয়া মোটা চশমার ওপর দিয়া কতকটা বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন, মনে হয় যেন থৈ পাইতেছে না। এ ধরণের লোকের সর্বদাই একটি অবলম্বন দরকার হয়; অনন্তবাবুর বাড়িতে আছেন গৃহিণী, কোর্টে পেশকার; না হইলে এক পা চলিতে পারেন না।

চোখের সামনে দিয়া খান-ছয়েক ট্রাম চলিয়া গেল। মোটা মানুষ, এমনই হাঁপানো অভ্যাস—এক একটা ট্রাম চলিয়া যাইতেছে, পকেট থেকে ঘড়িটা টানিয়া বাহির করিতেছেন, দেখিতেছেন আর হাঁপানিটা বাড়িয়া যাইতেছে। কাছে-পিঠে একটি ট্যাক্সির কি ফিটনের দেখা নাই, ওদিকে গাড়ির সময় হইয়া আসিল।

আরও একটি ট্রাম চলিয়া গেল। পাশের ভদ্রলোকটি ঠ্যালাঠেলি করিয়া উঠিতে গিয়াছিলেন, অকৃতকার্য হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তিনটে গেল, আপনি কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছেন?"

"সাতটা ট্রাম বেরিয়ে গেল। কি করা যায়? ট্রেনের সময় হয়ে গেল, আর যেতেই হবে আমায়।"

ভদ্রলোক একটু দুর্বল গোছের। একটু কি যেন ভাবিয়া লইয়া বলিলেন, "তা আপনি তো চেষ্টাও করলেন না। একটু জোর করে ঠেলে না উঠলে…"

"জোর করতে যাওয়াটা…"

অনন্তবাবু দ্বিধায় পড়িয়া চুপ করিয়া গেলেন একটু, তাহার পর আবার আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "ভায়লেন্সের মধ্যে পড়ে কিনা। একটু যদি একটা খালি পাই…এ'দিকে আর টাইমও নেই…"

ভদ্রলোক এক পা পিছাইয়া একবার আপাদমস্তক দেখিয়া লইলেন,

বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "আপনি তখন থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আইন-ধর্মের কথা ভাবছেন মশাই, এই বাজারে! বাড়ি থেকে না বেরোনই উচিত ছিল আপনার..."

...দেখিতেছেন, আর হাঁপানিটা বাড়িয়া যাইতেছে।

অনন্তবাবু অপ্রতিভ হইয়া আরও জড়িতভাবে বলিলেন, "না—না

—মানে, যদি অ্যাভয়েড করা যায়—একটু আবার ভারি শরীর কিনা…”

একটু হাসিবার চেষ্টা করিলেন।

আর একটা ট্রাম আসিতেছে। ভদ্রলোক একটু পিঠে হাত দিয়াই অনন্তবাবুকে সামনে করিয়া বলিলেন, “চলুন চলুন, ওসব ভাবে না এখন; ট্রামে ভিড় হ'লে যাতে ঠেলে উঠতে পারেন সেই জন্যেই তো মশাই ভারি শরীর দিয়েছেন ভগবান, আপনাদেরই তো মরশুম যাচ্ছে।”

ট্রাম দাঁড়াইতে খানিকটা ঠেলিয়া, খানিকটা উৎসাহ দিয়া তুলিয়া দিলেন, মোটা শরীরের আড়ালে যে জায়গাটুকু হইল তাহাতে নিজে গিয়া দাঁড়াইলেন। ভায়লেন্সের জন্য একটু চোখ রাঙানি, উগ্র মন্তব্য যে না হইল এমন নয়, ভদ্রলোকই মিনতি করিয়া, বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিলেন সবাইকে। ভিড়ের কেন্দ্রস্থলে একটু পা পাতিবার জায়গা পাওয়া গেল। ট্রামটা ছাড়িয়া দিল।

অনন্তবাবু চাপ ভিড়ের মধ্যে কোন রকমে বুকপকেট থেকে ঘড়িটা বাহির করিয়া সোজাভাবেই ঘাডটা হেঁট করিয়া দেখিয়া বলিলেন, “আর কুড়ি মিনিট আছে। যাক্, যাবে পাওয়া বোধ হয় গাড়িটা; ভাগ্যিস আপনি ছিলেন মশাই, নৈলে উঠতেই পারতাম না। উঃ!”

“আমারও তো ঐ কথা মশাই!”—বলিয়া ভদ্রলোক হাসিয়া উঠিলেন।

রহস্যটা ধরিতে একটু দেরি হইল, তাহার পর অনন্তবাবুও হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, “ও, আডালে আড়ালে এলেন, তাই?”

থলথলে মোটা মানুষের হাসি, চারিদিকে একটা চাপ পড়িল, অনেক

মুখেই বিরক্তির রেখা ফুটিয়া উঠিল, ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, "আপনি হেসেও ভায়লেন্স করছেন মশাই, ক্ষান্ত দিন...দেখছেন না ?"

হাসিটা বাড়িলই, বরং একটু সংক্রামকও হইয়া গেল। অনন্তবাবু হাসির উপরই একটু অপ্রতিভভাবে বলিলেন, "কী যে দুর্ঘট এই মোটা হওয়া মশাই ! ··যাবেন কোথায় ?"

ভদ্রলোক জানাইলে বলিলেন, "তাই নাকি ? আমারও তো ঐ ডেস্টিনেশন। এই ট্রেনেই তো ?"

"আর ট্রেন্ কোথায় এখন ?"

অবলম্বন না হইলে একদণ্ড চলে না, অনন্তবাবু যেন ভিতরে ভিতরে বর্তাইয়া গেলেন ; বলিলেন, "সঙ্গে সঙ্গে একটু থাকবেন মশাই।"

"না ভায়লেন্স করলে এমন সঙ্গ ছাড়ি কখনও ?"

আবার একটু হাসি উঠিল।

নামিবার সময় হইয়া আসিল। অনন্তবাবু হঠাৎ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "টিকিট হ'ল না যে ! আর বোধ হয় গোটা-তিন স্টপেজ মোট বাকি···হ্যাঁ মশাই, টিকিট যে হ'ল না !"

একটু ডিঙি মারিয়া উঠিয়া কন্‌ডাক্‌টারকে খুঁজিতে লাগিলেন।

ভদ্রলোক শুনিয়াও চুপ করিয়াছিলেন, দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করায় বলিলেন, "টিকিট না নিয়ে আপনি নামবেন না ?"

শুধু বিবেক নয়, বিচারাসনের ছবিটাও এক ঝলকে মনে পড়িয়া গেল অনন্তবাবুর—গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন, সামনে বিচারপ্রার্থীর প্রতিভূরূপে উকিলের দল, পাশে কাঠগড়া। ব্যাকুল ও বিস্মিতভাবে অনন্তবাবু বলিলেন, "টিকিট না নিয়ে···এতদূর এলাম···"

মাথা ঝুঁকাইয়া চশমার মধ্যে দিয়া চাহিয়া রহিলেন।

অতি ধার্মিকের পাল্লায় পড়িলে বিরক্তিই আসে মানুষের; এমনি ব্যাপারটাই অস্বাভাবিক, তাহার উপর নিজেও অযথা একটু খেলো হইয়া যাইতে হয়। ভদ্রলোক একটু গম্ভীর হইয়াই বলিলেন, "তা হ'লে তাই নামবেন, আজ যখন হয় একবার আসবেই তো এদিকে।"

অনন্তবাবু যন্ত্রচালিতের মতোই পকেটে হাত দিয়া ভাড়াটা বাহির করিলেন, আরও ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "কি উপায় তা হ'লে? ভাড়াটা না দিয়ে···কখনও যা করিনি জীবনে···"

একটা স্টপেজ কাটিয়া গেল। পুরাণ ধাঁচার ট্রাম—একেবারে শেষ দিকে একটি দরজা, সেইখানটাতেই ইঁহারা চাপ ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া; লোকে নামিতেছে, উঠিতেছে, পিষিয়া যাইতেছে, বচসা করিতেছে—মেজাজ এমনই কটু হইয়া ওঠে। ভদ্রলোক একটু বিরক্তভাবে ব্যঙ্গের স্বরে বলিলেন, "আমি তো যাচ্ছি নেমে মশাই, আমার অত ধর্মজ্ঞান নেই।"

একটু চুপ করিয়া তর্কের ভঙ্গীতে বলিলেন, "কন্‌ডাক্‌টারকে দেখছেন তো? একেবারে গাড়ির ও-মুড়োয়, মাঝখানে দাঁড়িয়েই কিছু নয় তো বোধ হয় জন-পঞ্চাশেক লোক আছে। যদি হাঁক দেন, আর শুনে আসতে চায়—তবুও আধঘণ্টার মামলা···"

তর্কের ঝোঁকে আরও দু'পাঁচজনকে সাক্ষী মানিয়া বলিলেন, "কেন, আমাদেরই গরজ নাকি মশাই? পয়সা লুটছে, দু'তিনটে করে কন্‌ডাক্‌টার আরও বাড়িয়ে দিতে পারে না প্রত্যেক ট্রামে? নিন্‌, এসে গেল, এখন থেকে না চেষ্টা করলে বেরুতেই পারব না,—এক রকম জ্বালা?"

যেন বিচারাসনে বসিয়াই একটা আরগুমেণ্ট শুনিতেছিলেন অনন্তবাবু। শেষ হইলে একবার ঘড়িটা টানিয়া বাহির করিলেন। একটু

বোধ হয় দ্বিধা হইয়া থাকিবে, তাহার পরই ভাড়াটা হাতে করিয়া পাশ কাটাইতে কাটাইতে ভদ্রলোকের অনুগমন করিলেন।

অনন্তবাবু আসিয়াছিলেন এক বন্ধুর মোটরে, স্টেশনের যে আবার কি অবস্থা, কিছু কিছু শোনা থাকিলেও ঠিকমত জানা ছিল না। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া যেন আরও দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। জনসমুদ্র! লোকেরা পোঁটলাপুঁটলি লইয়া নিরাশ হইয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া আছে—ভারতবর্ষে যতরকম জাত আছে—ছেলে, বুড়ো, মেয়ে-মদ্দ—তাহারই মধ্যে আবার একটা চঞ্চলতা—মানুষ ডিঙাইয়া, পুঁটলি ডিঙাইয়া যাওয়া আসা, গাড়ির চেষ্টা, আহার্য সংগ্রহ, হারানো ছেলে-মেয়ে খোঁজা সব রকমই ব্যাপার আছে। এই জনসমুদ্র অতিক্রম করিয়া গাড়ি ধরিতে হইবে! একটু যে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, নামিবার সময় তাহাতেই সঙ্গীহারা হইয়া গেছেন। পদমর্যাদা ভুলিয়া অনন্তবাবু ব্যাকুলভাবে ডাকিয়া উঠিলেন, "ও মশাই, কোথায় গেলেন? নামটাও যে জিজ্ঞেস করা হ'ল না…"

একটা ছোট ভিড়ের আড়ালেই সামনে ছিলেন ভদ্রলোক, পিছনে একটু ঝুঁকিয়া প্রশ্ন করিলেন, "নামলেন শেষ পর্যন্ত?"

"হ্যাঁ, ভেবে দেখলাম…"

"আপনি ভেবে দেখতে গিয়েই সব মাটি করবেন। চলে আসুন—বাবাজীর ঐ পুঁটলিটা ডিঙিয়ে…আবার থমকে দাঁড়ালেন?"

একজন বাবাজী পাশে গোটা-কতক গেরুয়া কাপড়ে বাঁধা পোঁটলাপুঁটলি রাখিয়া ঘুমাইতেছে—ঘুমন্ত লোকও আছে এ আসরে—অনন্তবাবু পোঁটলাসুদ্ধ তাহাকে ডিঙাইয়া ভদ্রলোকের কাছে গিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "কি দুর্গ্রহ—কি অন্যায় অনাচারটাই হচ্ছে মশাই!"

ভদ্রলোক বলিলেন, "এবার আমিই এগুই, আপনি পেছনে পেছনে

আসুন। কিছু নয়, অন্যায়-অনাচার আবার কি? ভেবেছেন বাবাজীর ঐ পুঁটলির মধ্যে ঠাকুর দেবতা আছেন? রামঃ, এত ডিঙিয়েছে লোকে যে তিনিই ডিঙিয়ে কোন পগার পারে চলে গেছেন। আর অন্যায়-অনাচার হ'লেও করছেন কি বলুন? আর কারা করাচ্ছে এই সব, কারা সব দায়ী এই অবস্থার জন্যে সেটাও ভেবে দেখুন—অ্যাক্সিস্ আর অ্যালাইজ্‌দের চাঁইয়েরা তো? 'ত্বয়া হৃষিকেশ' গোছের করে সব পাপ তাদের ঘাড়েই চাপিয়ে দিন না মশাই; আমি তো এই সার বুঝেছি…"

তত্ত্বকথা শুনিতে শুনিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া, ডিঙাইয়া ফেলিয়া দুইজনেই চলিয়াছেন, এক জায়গায় আসিয়া অনন্তবাবু বলিলেন, "ও দিকে কোথায়? টিকিট-ঘরটা এদিকে যে…"

"টিকিট!"—বলিয়া ভদ্রলোক বিস্মিতভাবে ফিরিয়া চাহিয়া বলিলেন, "টিকিট আপনাকে দিচ্ছে কে মশাই? এক ঘণ্টা আগে বন্ধ হযে গেছে, ঐ তো কাউণ্টার বন্ধ করে দিয়েছে, দেখছেন লোক আছে ওখানে?"

অনন্তবাবু দাঁড়াইয়া পড়িলেন, প্রশ্ন করিলেন, "তবে?"

মাথাটা ঝুঁকাইয়া চশমার মধ্য দিয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন—থৈ পাইতেছেন না।

"ঘুষ! আপনি কি অন্য কোন গ্রহ থেকে সদ্য নেমে এসেছেন নাকি?"

অনন্তবাবুর হাঁ'টা এতবড় বড় হইয়া গেল যে গোঁফে আর চিবুকে কোন সম্বন্ধ রহিল না। বলিলেন, "ঘুষ! ঘুষ কি মশাই?"

"এখানে গেটে ঘুষ, গাড়িতে চড়ে ঘুষ, সেখানে গেট দিয়ে বেরুতে ঘুষ। আপনি কি ভরসায় বেরিয়েছেন তাহ'লে?"

"আমি ঘুষ দোব কি মশাই! আমি যে…"

কি ভাবিয়া পরিচয়টা আর দিলেন না! ভদ্রলোক আর কথা না বাড়াইয়া আগাইয়া চলিলেন। অনন্তবাবু নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; একটুখানির মধ্যে কত কি যে মনের মধ্যে খেলিয়া গেল—সংস্কার, বিবেক, আইন, কোর্টে বিচারকের আসন; এদিকে—যাওয়া যে নিতান্তই দরকার, এই ডামাডোলের সময়—তিনিই মহকুমার মালিক—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মাঝে মাঝে আচমকা আসিয়া যাইতেছেন পরিদর্শনে…আর আদর্শই বা থাকিল কৈ? ভায়লেন্সও করিয়াছেন—না হয় অগ্রাহ্য করিলেন সেটা; কিন্তু টিকিট তো কেনা হয় নাই ট্রামে? হাতের পয়সা কটাও কখন্ অন্যমনস্কতার মধ্যে পকেটে ফিরিয়া গেছে।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই এলোমেলো ভাবে সবগুলা মনের পর্দায় একবার খেলিয়া মিলাইয়া গেল—স্পষ্ট হইয়া রহিল শুধু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের চেহারাটি—পরিদর্শনে আসিয়াছেন—এস্-ডি-ও নাই শুনিয়া বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন—সে-বিস্ময়ের সামনে অনন্তবাবুর এ-বিস্ময়ের তুলনাই হয় না। একবার ঘড়িটা দেখিয়া লইলেন—ঠিক আর সাতটি মিনিট, ডাকিলেন, "ও মশাই! নামটাও জিজ্ঞাসা করা হ'ল না এ পর্যন্ত।"

দ্বিতীয়বার ডাকার পর ভদ্রলোক ঘুরিয়া চাহিলেন।

"তা হ'লে দাঁড়ান একটু।"

ডিঙাইয়া, মাড়াইয়া নিকটে আসিয়া বলিলেন, "আর কি করা যাবে? যেতে যে হবেই আমায়।"

"যুদ্ধের বাজারে ঐটেই বড় কথা মশাই! নিন্, এবার তাহ'লে আপনি এগোন, কোট-প্যাণ্ট পরে আছেন, কাজ হবে। ঘুষ যদি নেয় সে তো অনুগ্রহ মশাই, তাও নিতে চায় না, মানে ওদিকে আবার

গাড়িতে জায়গা হওয়া চাই তো? আপনি বে-আইনির কথা বলছেন —কোনটে আইন দেখে হচ্ছে মশাই? আমার যাওয়া চাই; তুমি কোম্পানি খুলে বসেছ—অথচ গাড়ির জোগান্ দিতে পারছ না—যেন তেন প্রকারেণ আমায় যেতেই হবে না? এতে তোমার পাওনা-গণ্ডা যদি বাদ পড়ে তো আমি করব কি? আর আমি তো ইচ্ছে করে তোমার হক্ মারছি না, তুমিই টিকিটঘরের জানলা বন্ধ করে বসে আছ।···ভেবে দেখুন না কথাটা মশাই, অন্যেয্য কি? ধর্মের দিক দিয়েও দেখুন—আমার তো একের জায়গায় চার যাচ্ছে পকেট থেকে, যার হাতেই যাক্—অধর্মটা হ'ল কোথায় শুনি?"

তত্ত্ব-কথা শোনাইতে শোনাইতে ভিড় ঠেলিয়া গেটের কাছাকাছি আসিয়া বলিলেন, "একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে রাখবেন, আর দেখুন..."

অনন্তবাবু ফিরিয়া চাহিলে নিজেকে দেখাইয়া বলিলেন, "বলে দেবেন দু'জন।"

কোন রকমে ফার্স্ট ক্লাসে একটু জায়গা পাওয়া গেল। এই কয়টা স্টেশনের মধ্যে গাড়িতে কিন্তু ক্রু উঠিল না কোন। তাহারাও টিকিট দেয়, একটা লইতে পারিলে মনের খুঁৎখুঁতানিটা যাইত কতকটা। কিন্তু সে লড়াইয়ের চাপে এর মধ্যেই মনের অনেকটা পরিবর্তন হইয়াছে, পাঁচটা টাকা যে গেছে তাহা শুধু বিবেকেই ঘা দেয় নাই, আঁতেও ঘা দিয়াছে, যেটুকু বাঁচিল, সেটুকুর জন্য সান্ত্বনা পাওয়া যাইতেছে অনেকটা।···এইবার নামিবার সময় কি করিবেন? আবার ঘুষ?

মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছেন অনন্তবাবু। বিবেকও সায় দিয়াছে;

ঠিক বিবেক না হইলেও অন্তত: বিচার বুদ্ধি তো বটেই—এখানকার বড় অফিসার একজন, স্টেশনে চেনে সবাই, এখানে তো ঘুষ দেওয়া চলিবে না তাঁহার।

ঠিক করিয়াছেন, ছড়িটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া যাইবেন—কাহাকেও সি-অফ্ করিতে আসিয়াছিলেন।...বেশ হালকা বোধ হইতেছে মনটা।

প্ল্যাটফর্মে ভিড়ই নামিল প্রচণ্ড। অনন্তবাবু এবার ইচ্ছা করিয়াই একটু গা-ঢাকা দিয়া ভদ্রলোকটির নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। তাহার পর একসময় নেহাৎই সি-অফ্ করিতে আসার মতো করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। টিকিটচেকার হাত তুলিয়া একটি সেলাম করিল।

* * *

আদালতের বিচারাসনে বসিয়া প্রথমে অফিস-সংক্রান্ত কতকগুলা কাজ করিলেন; কিছু দস্তখৎ, কিছু অর্ডার দেওয়া, কোন ব্যবস্থা মঞ্জুর করা। তাহার পর পেশকার কেসের ফাইল পাশে রাখিয়া দিল।

প্রথমেই একটি বিনা-টিকিটে রেল-ভ্রমণের কেস। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ বলিয়া একটু মাথা গুঁজিয়াই পড়েন। সমস্তটা পড়িয়া গেলেন; আজ এ ধরণের কেস কেমন একটু লাগিতেছে যেন। আসামী বলিতেছে, সে টিকিট কিনিয়াছিল, কিন্তু পকেট কাটা যাওয়ায় ব্যাগসুদ্ধ সব গেছে। এক্‌জিবিটের মধ্যে কাটা পকেটসুদ্ধ একটি জামা।

"হুঁ, আসামী হাজির? কি নাম?"—বলিতে বলিতে মাথা তুলিয়া অনন্তবাবু স্থাণুবৎ নিশ্চল হইয়া গেলেন।

কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া সেই ভদ্রলোকটি, এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত যিনি নানা তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে

নানা অবস্থার মধ্য দিয়া, নানা বিপদ কাটাইয়া—কলিকাতা হইতে এখানকার স্টেশন পর্যন্ত লইয়া আসিয়াছেন তাঁহাকে—অর্থাৎ নিজের বিচারককে।

মাথা নিচু করিয়া, গোঁফে চিবুকের সমস্তটা ঢাকিয়া অনন্তবাবু চশমার উপর দিয়া ঠায় চাহিয়া রহিলেন; কিছু থৈ পাইতেছেন না।

মেয়ে

প্যাসেঞ্জারটা তালিত স্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। নামমাত্র স্টেশন, তবুও কি ভিড! সেই ইতর-ভদ্র, মেয়ে-পুরুষ, বোঁচকা-বুঁচকি। কোন্‌ ক্লাস লক্ষ্য নাই, ছুটিয়া ছুটিয়া আসিয়া জমা হইতেছে, তাডা খাইতেছে, কিছু জমিয়া যাইতেছে, কিছু আবার অন্য কামরার উদ্দেশ্যে ছুটিতেছে। হুমকি, কথা-কাটাকাটি—

"আগে নাবতে দাও—আরে, নাবতে দিন আগে মশাই—কি গেরো! দেখ, তবুও ঠেলে আসে!"

"গাড়ি যে এক্ষুনি ছেড়ে দেবে, মশাই!"

"ছেড়ে দিলে আপনি পরের গাড়িতে উঠতে পারবেন, আমি নাবতে পারব পরের গাড়ি থেকে?"

কথা-কাটাকাটির মধ্যে ও নামিলও, এ উঠিয়াও পড়িল। সে যে কি রকমারি দাঁওপ্যাচ, না দেখিলে বোঝা যায় না।

নামিবার দল কিন্তু এবার মারমুখো হইয়া পড়িয়াছে। নামিতেছে একটা চাপ, মাঝে পড়িয়া গিয়াছে একটা চৌদ্দ-পনরো বছরের ছেলে।

"বাবা, আমার যে পা দুটো উঠে গেছে ভুঁই থেকে!"

খানিকটা পিছনেই একজন বৃদ্ধ —

"সামনের ভালোমানুষটির গলাটা জইড়ে ধর্‌।"

"খবরদার!—কি রকম ভালোমানুষ, দেখিয়ে দোব একেবারে!"

"বাবাঃ, কবে যে নড়াই থামবে!"

"আরে নাম্‌ বুড়ো, লডাই না থামলে নামবি নি নাকি?...আবদার! এদিকে গাড়ি দেয় ছেড়ে!"

প্ল্যাটফর্মের দিকের বেঞ্চটায় বসিয়া আছি, খানিকটা কোণ ঘেঁষিয়া। দৃষ্টিটা দরজার খণ্ডযুদ্ধের পানেই, হঠাৎ জানালা দিয়া একটা বেশ বড় টিনের স্যুটকেস আমার কানের কাছ দিয়া খানিকটা ভিতরে আসিয়া পড়িল, পিছনে একটা রিস্ট্‌ওয়াচ-পরা হাত। অন্যমনস্ক ছিলাম, রাগিয়া উৎকট দৃষ্টিতে মুখ ঘুরাইয়া চাহিতেই স্যুটকেসের মালিক দীন মিনতিতে আমার বাঁ হাতটা চাপিয়া ধরিল, হাঁপাইতেছে: "দোহাই! —স্কুলমাস্টার—গ্র্যাজুয়েট—সঙ্গে—সঙ্গে লেডি—দোহাই—"

একটা আঁচড় লাগিয়া গিয়াছে স্যুটকেসের কোণে, রাগটা সঙ্গে সঙ্গেই কাটাইয়া উঠিতে পারিলাম না, বলিলাম, "আমি তো স্কুলের ছাত্র নয় মশাই, কানটা যে ছিঁড়ে যেত এক্ষুনি।"

আরও ব্যাকুলকণ্ঠে মিনতি: "দোহাই!—ওগো, এগিয়ে এসো না—গার্ড হুইসিল দিলে, দোহাই—"

"একেবারে যে জায়গা নেই, উঠবেনই বা কি করে?"

বলিতে বলিতেই স্যুটকেসটা লইলাম, সেটা না রাখিতে রাখিতেই কাঁধের উপর একটা বিছানার গাঁট আসিয়া পড়িল, তাহার উপর একটা হ্যাণ্ডেল দেওয়া বাঁশের টুকরি। সব আমার চার্জে দিয়া এঁরা তখন দরজায়; লেডি উঠিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন, উনি নিজে তখনও দুইটি ধাপ নিচে। গাড়ি হুইসিল দিল।

প্রতিদিনের ব্যাপার—প্রতি স্টেশনের, মনটাকে কেমন অবসাদগ্রস্ত করিয়া দিয়াছে। তবুও তো বসিয়া থাকা যায় না চুপ করিয়া! বাক্স-বিছানা সামনে জড়ো করিয়া রাখিয়া উঠিলাম। কতকটা বুঝাইয়া, কতকটা হুমকি দিয়া অতি কষ্টে দুইজনের ভিতরে আসিবার একটু রাস্তা করিলাম। পুরুষটি যুবা, বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হইবে, মেয়েটি নিশ্চয় তাহারই স্ত্রী, নবপরিণীতা। বয়স সতেরো-আঠারো, তবুও

ছেলেমানুষই তো ?—পরিশ্রমে আর এতগুলা পুরুষের মধ্যে কি রকম হইয়া গিয়াছে। বলিলাম, "তুমি যাও মা, ওখানে ব'সোগে।"

নিজের জায়গাটা দেখাইয়া দিলাম। আমার সঙ্গে ছিল আমার ভাইঝি, মেয়েটি তাহার পাশে গিয়া বসিল। তাহার পর জামাকাপড় একটু গুছাইয়া লইয়া একবার উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে দরজার পানে চাহিল। কষ্ট হয়, নূতন পরিণয় ; কিন্তু উপায় তো আর ছিল না, নিজের জায়গার পাশেই মোটঘাটের মধ্যে কোন রকমে দুইটা পা পুতিয়া বাক্স ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। যুবককে দরজার কাছেই কোন রকমে গুটিসুটি মারিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। কষ্ট হোক্, কিন্তু চোখে একটি তৃপ্তি আছে, বেশ টের পাওয়া যায়। চাহিয়া চাহিয়া কয়েকবার মেয়েটির দিকে দেখিল। গাড়ি এদিকে বেশ মোশন দিয়া দিয়াছে।

গোলমালের জের খানিকটা চলিল। সেটি থামিলে শুনিলাম, মেয়েটি বেশ সপ্রতিভকণ্ঠে গল্প আরম্ভ করিয়া দিয়াছে আমার ভাইঝির সঙ্গে। বোধ হয় সুযোগ হইয়াছে—আমার মুখটা দরজার দিকে ফেরানো। একবার ঘুরিয়া দেখিলাম, সে মেয়েই নয়, দিব্য আসনপিঁড়ি হইয়া মুখামুখি হইয়া বসিয়াছে, মাথার একটু কাপড় নামিয়া গিয়াছে, ভ্রূক্ষেপও নাই সেদিকে ; হাত নাড়িতেছে, মাথা দুলাইতেছে, বেশ বোঝা যায়, গাড়ির সমস্ত ব্যাপারটা মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছে—মনে হয়, গাড়িটা পর্যন্ত। যেন বাড়িতে বসিয়াই নিভৃত আলাপ জমাইয়াছে।

বেশ কৌতুকপ্রদ মনে হইল ; যেমন গল্পের বিষয়টি বাছিয়াছে, তেমনই বলার ভঙ্গীতেও স্বকীয়তা সুস্পষ্ট। যাহা বলিবার প্রায় একটি প্রশ্নের আকারে বলে, যেন ধরিয়া লইতেছে একটা

স্বয়ংসিদ্ধ ব্যাপার, চিত্রগুলি বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠে। অভিমতও বেশ জোরালো।—

"তা আমাদের তো ভরসার মধ্যে মাত্র বিঘে কয়েক ক্ষেত? পারবে কেন অত দিতে বাবা? শেষে অনেক কষাকষি, অনে—ক কষাকষির পর এইতে রাজি করানো গেল এঁদের—এই ওপর হাতে আর্মলেট, নিচের হাতে চারগাছি করে চুড়ি, একটি করে রুলি। এই হার পাঁচ ভরির; প্যাটার্ন্‌টুকু ভালো, কিন্তু ফাঁকি। এখন এই যাচ্ছি, ওঁরা দেখে যদি নাক সিঁটকোন, দুটো কথা বলেন তো, সেটা কি ভদ্দরলোকের মতন হয়? ওঁরা এইটেকে সাত ভরি করে দেবার কথা বলেছিলেন তো? তা কি করে হয় তুমিই বলো না, ভাই? দিতেন বাবা, যখন কথা দিয়েছিলেন, কিন্তু দেশের অবস্থা যে কি হয়ে পড়ল, কারুর জানতে বাকি আছে কি?…কি বন্যে, কি বন্যে, কি বন্যে! যদি দেখতে তুমি! এক মুঠো ধান তো ঘরে উঠল না। একে তো লড়াইয়ের এই দুর্গতি!…বলেন, আমিও শুনিয়ে দেব। ইস্কুলে পড়া মেয়ে কারুর তোয়াক্কা রাখি না…"

ভাইঝি প্রশ্ন করিল "ম্যাট্রিকুলেশান পাস?"

একটু চুপ করিয়া মুখটা ফিরাইয়া দেখি, জানলার বাহিরে চাহিয়া আছে। অর্থাৎ প্রশ্নটা এড়াইয়া গেল। আবার মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, "আর কেনই বা বলব না? তোমাদেরও বুঝে-সুঝে খোঁটা দেওয়া উচিত, এ তো সেই ঠানদিদির আমলের কনে-বউ নয়? সইতে যাবে কেন বাপ-মায়ের নিন্দে? মা আসবার সময় এক পাশে নিয়ে গিয়ে এমনি করে হাত দুটি ধরে বললেন, 'শচী, মা আমার'…"

হঠাৎ গলাটা গাঢ় হইয়া বন্ধ হইয়া গেল। একটু চাপা কান্নার

শব্দ হইল, আমার ভাইঝি সান্ত্বনা দিল, "চুপ করুন, শীগ্‌গির তো আবার ফিরে আসছেন।"

একটু পরে কান্নার শব্দ ধীরে ধীরে থামিল। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মেয়েটি যেন বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গাড়িটা খানা জংশনে থামিল, ওঠা-নামার সেই হট্টগোল, আবার ছাড়িয়া দিল। মনটা বেশ হালকা হইলে মেয়েটি আবার সহজ গল্প আরম্ভ করিল—"হাত দুটি ধরে বললেন, 'শচী, মা, হারটি তো কথামাফিক আমরা দিতে পারলাম না; তবে একটু সামলে উঠলেই আবার ওটুকু পুরো করে নতুন করে গড়িয়ে দোব। শাশুড়ী তোর দেবে গঞ্জনা একটু সয়ে যাস; বুঝিয়েই বলিস, নিশ্চয় বুঝবে, মানুষই তো, দেখলে তো কি বন্যেটা ঘাড়ের ওপর দিয়ে গেল! না বোঝে, সইবি চোক-কান বুজে।...সইবার মেয়ে কিনা শচী। এমন মিষ্টি মিষ্টি করে শুনিয়ে দোব! ইস্কুলে-পড়া মেয়ে আমি, খাতির বুঝি না। নিজেদের মেয়ে হাতে তুলে দিলে তোমাদের, সেটা বুঝি কিছু নয়? তার ওপর গঞ্জনা! ইস, সে যুগ আর নেই!"

কথাগুলির গুরুত্বেই মেয়েটি এবার চুপ করিয়া রহিল একটু। তাহার পর আবার শুনিতে লাগিলাম।

"ভাইবোনে তো আমরা ন'টি? বোন এই দুজন বিদেয় হলাম, এখন বাপ-মায়ের ঘাড়ে তিনটি তো? তা ভিন্ন দুটি ভাইয়েরও তো খরচ যোগাতে হচ্ছে? হয় কোথা থেকে ভাই? সম্বল তো ওই ক' বিঘে ক্ষেত, তাও দামোদরে খেলে। মানুষ।—যখন দেখলে এমন একটা দৈব বিপদ ঘাড়ের ওপর দিয়ে বয়ে গেল, মানুষ হ'লে শুধু শাঁখা-শাড়ি নিয়ে বউ ঘরে আনতে, অন্ততঃ এটুকু বলতে, 'থাক্ বেয়াই, গয়নাগুলো নাহয় এর পরে দিও, একটু সামলে ওঠ আগে'।...বেশ,

তাঁরা নাহয় পাড়াগেঁয়ে মানুষ, একটু লুভিষ্টি—তুমি তো বি-এ পাস, একটা ইস্কুলের সেকেণ্ডমাস্টার, ছেলেদের ভালোমন্দ শেখাচ্ছ; বিজ্ঞ, জ্ঞানী বলে সমাজে একটা খাতির আছে, তুমি কোন্ বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের বলতে পারলে?...ওই দাঁড়িয়েই আছেন সামনে, আমি কিছু ভয় করে বলছি না। শুধু গয়না? এক কাঁড়ি জিনিসপত্র—এসে পৌঁছল না যে, নইলে দেখতে; পরের গাড়িতে দাদাকে পৌঁছে দিতে হবে।...বে এখনও হয় নি, দিব্যি আছ ভাই, দেখবে, শ্বশুরবাড়ি মানেই শুধু দাও—দাও—আর দাও; ঘেন্না ধরিয়ে দিয়েছে!"

গলসি আসিয়া পড়িল। আপ্ প্ল্যাটফর্মের পাশেই একটি বেশ মাঝারি গোছের পুষ্করিণী, চারিদিকে গাছ-পালা। ছায়ায় বসানো তিনটি পালকি, জনকয়েক বেয়ারা বসিয়া শুইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

প্ল্যাটফর্মেও জন চারেক ভদ্রলোক অপেক্ষা করিতেছিলেন। হৈ-চৈ ঠেলাঠেলির মধ্যে বর-বধূ নামিল, জিনিসপত্রগুলা নামাইয়া দিয়া আমিও নিজের জায়গাটি দখল করিলাম। দলটি পুষ্করিণীর অভিমুখী হইল।...গাড়ি যখন ছাড়িল, দেখি, দূরে পালকির দোরের কাছে ঘোমটাটি দুই হাতে একটু তুলিয়া মেয়েটি আমাদের গাড়ির পানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

তাহার পর কয়েকবার এইখান দিয়া যাতায়াত করিয়াছি। গলসিতে গাড়ি থামিলেই ছায়াশ্যামল পুষ্করিণীর দিকটিতে চাহিয়া থাকি। সমস্ত চিত্রটি জাগিয়া উঠিয়া কৌতুকে কৌতূহলে মনটা আচ্ছন্ন করিয়া তোলে। সেই প্রগল্‌ভা নববধূ, গুরুগম্ভীর তাহার অভিমত সব,—বিদায়ের স্মৃতিতে গলা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠা—তাহার পর সেই

শেষ দৃশ্য—পালকির দ্বারপথে দুই হাতে ঘোমটা তুলিয়া আমাদের গাড়ির দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকা।...আর একবার দেখা পাইলে বেশ হইত।

দুই বৎসর পরে আবার দেখিলাম। আমার ভাইঝির বিবাহ হইয়া গিয়াছে, একটা কাজে বাপের বাড়ি আসিয়াছিল, তাহাকে পৌছাইতে যাইতেছি।

বেশ খানিকটা দূর হইতেই গলসির সেই পুকুর-পাড়ের কোণটিতে একটা পালকি দেখিয়া মনটি একটু উৎসুক হইয়া উঠিল। গাড়ি প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিলে দেখিলাম, সেই দম্পতি, মেয়েটির কোলে একটি ন'দশ মাসের ফুটফুটে শিশু। আমাদের গাড়িটা প্রায় তাহাদের কাছাকাছি গিয়া দাঁড়াইল, আমি হাঁক দিয়াই ডাকিয়া লইলাম যুবককে। শিশুটিকে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী জানালা দিয়া তুলিয়া লইল। মোটঘাট তুলিয়া দুইজনে উঠিল, মেয়েটি আসিয়া আবার প্রায় সেই রকম ভাবেই আমার ভাইঝির পাশটিতে উপবেশন করিল। আমার এবার উঠিবার খুব বেশি দরকার ছিল না, তবে আমার পাশেই মেয়েটির বসিবার জায়গা হওয়ায় আমি ওই ওজুহাতেই উঠিয়া দাঁড়াইলাম। নইলে গলা খুলিবে না তো? যুবক দরজার কাছে বেঞ্চের কোণটিতে একটু জায়গা পাইল। এদিকে কান রাখিয়া আমি যুবকের সঙ্গে অল্পস্বল্প আলাপ জুড়িয়া দিলাম। এ আবার একটু মিতভাষীই। প্রজাপতি বি-ষমেরই মিলন ঘটাইতে ওস্তাদ কিনা!

গল্প এবারে সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।—

"ওমা, তোমারও বিয়ে হয়ে গেছে! দিলেন বাপ-মা বিদেয় করে শেষ পর্যন্ত? এ যে কি বিদেয় করা ভাই, মর্মে মর্মে বুঝবে এবার।"

ভাইঝি প্রশ্ন করিল, "সেই এসেছেন, আর এই প্রথম—"

"না, অতটা এখনও হয় নি ; এই তো কাছে-পিঠেই। কয়েকবার গেছি এসেছি। তা ভাই তুমিই বলো না—আর কি হুট বলতে আমিই নাপিয়ে বাপের বাড়ি যেতে পারি ?—এখন একজনদের সম্পত্তি তো ? তায় ভগবান ওই গুঁড়োটি দিয়েছেন—শ্বশুরের তো নয়নের পুতুলি বললেই হয়।—চলে এখন আমার হুট বলতে বাপের বাড়ি যাওয়া ?···তা বাপ-মা-ভাইদের একটু অভিমান হয়। তা যে দোষের তা বলছি না, বাপ-মা-ভাইই তো ? তবে আমিই বা কি করি বলো ভাই ? দাদার ছেলেটির অন্নপ্রাশন, চিঠি এলো, লোক আসবে নিতে, আর হবি তো ঠিক সেই সময় এদিকে মেজো দেওরের ছেলেরও ভাত। জা'টি আবার আমার বড় নেওটো—দিদি না হলে একদণ্ড চলে না, মেজো দেওরও বউদি-অন্ত প্রাণ। গেলে বলবে—'দেখ, নিজের ভাইয়ের ছেলে, বউদি কেমন দিব্যি ছেড়ে চলে গেলেন।' শ্বশুর-শাশুড়ী অবশ্য বললেন, 'বউমা, যাও, ভাইয়ের প্রথম সন্তান, দরকার যাওয়া ?'—লোক ওঁরা দু'জনেই খুব ভালো কিনা—তা নিজের তো একটা আক্কেল বলে···"

হাসি পাইল। খুলিল মেয়ের স্বরূপ ?—এই দুইটা বৎসর যাইতে না যাইতেই ?

আমার ভাইঝিও হাসিয়া বলিয়া ফেলিল, "আমি থাকলে তো চলে যেতাম।"

"ও ভাই, বলা সহজ, কাজে ততটা সহজ নয়, দেখতে পাবে। কি বাঁধনে যে বাঁধে ! দেওরের ওই ছোট্ট ছেলেটি তো ? এক দণ্ড না দেখলে পরে প্রাণ আই-ঢাই করে। এই চলে এসেছি, 'জেতি জেতি' করে সমস্ত বাড়িটা···"

গলাটা গাঢ় হইয়া আসিল, গল্প একটু থামিল। এবারে অবশ্য

তা আমিই বা কি করি বলো, ভাই ?

মায়ের নিকট বিদায়ের সে ক্রন্দন নয়, তবে স্রোতের উল্টা গতিতে আমায় সেই কথাই মনে করাইয়া দিল। আবার আরম্ভ হইল—

"বাইরে মন বসানো কি কম শক্ত ভাই? এর ওপর আবার বুড়ো শ্বশুর আছেন, শাশুড়ী বড্ড পিটপিটে শুচিবেয়ে, সব্বদা সামলে থাকতে হয়।...তাই বলছিলাম—কি পরই যে করে দেন বাপ-মায়ে!..."

উল্টা আমাদেরই দোষ দেয় যে! হাসিতে এবার মুখটা কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, অনেক কষ্টে সামলাইয়া লইলাম।

গাড়িটা থানা জংশনে আসিয়া দাঁড়াইল। আবার সেই হট্টগোল —যুদ্ধদানবের যুদ্ধশিশু। খানিকটা সামিল হইয়া যাইতেই হয়, গল্পের দিকে আর মন রাখা সম্ভব হইল না। গাড়ি ছাড়িয়া দিল, কতকটা শান্তি আসিল, আবার কানে আসিল—

"হ্যাঁ, সেই সোনাটা, হারে সেই দু'ভরি কম পড়ে গিয়েছিল না? এখন পর্যন্ত তো সেটা পূরণ করেন নি। শ্বশুর অত্যন্ত ভালো লোক, কোনমতেই চাইবেন না মুখ ফুটে, আর পেছনে ওই যে মানুষটি দেখছ —মানুষ বললেও চলে, আবার জড়োপদাথ বললেও চলে। লাজুক, মুখচোরার একশেষ—ইস্কুলমাস্টারই তো? নিজের পাওনা-গণ্ডা নিজে বুঝে নিতে হবে তো?—না, 'কি মনে করবেন তাঁরা, সামান্য দু'ভরি সোনা।'...শোন কথা ভাই—দু'ভরি সোনা, আজকালকার বাজারে কম হ'ল!—কিছু-না কিছু-না করেও যার নাম দুশোটি টাকা। শেষ-কালে কিনা আমাকেই মেয়ে হয়ে লিখতে হ'ল..."

আমার ভাইঝি একটু বিস্মিতভাবেই প্রশ্ন করিল, "আপনি লিখলেন?"

মেয়েটি একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল যেন, একটু লজ্জাস্তিমিত কণ্ঠে বলিল, "সে রকম ভাবে কি লিখলাম? তা কি পারি কখনও? মেয়েই তো, আর মা-বাপই তো তাঁরা?...গাছের ডালটাই না হয় আলাদাই হ'ল—সম্বন্ধ তো ঘোচে না?...লিখলাম—'মা, খোকার অন্নপ্রাশনের

সময় একটা কিছু সোনা-দানা না দিলে একটু নিন্দে হবে। হেমার বিয়েতে হয়ে গেছে অনেক খরচ, তা অন্তত: ভরি খানেকের একটা কিছু যদি পারো দিতে, দেখো। না পারো, তোমাদের আশীর্বাদই যথেষ্ট।'

"মন্দ হ'ল ভাই? যখন সাত মাসেরটি তখন খোকা বড্ড ভুগলো বলে ডাক্তারের মতে অন্নপ্রাশনটি পেছিয়ে দিতে হ'ল; মাস তিনেক সময় পেলেন, একটু সুবিধেও তো হ'ল? তবু এটুকুও লিখতাম না; হাজার হোক্, মা-বাপই তো? মনে করবেন, 'দেখ, ওই যে দু'ভরি সোনা-পড়ে আছে, বেয়াই লিখলেন না, বেয়ান লিখলেন না, মেয়ে পাকে-প্রকারে আদায় করে নিচ্ছে।' লিখলাম, এই আসছে বোশেখে ভাত তো?—তা এঁরা কিছু দিতে পারবেন না। আর কোথা থেকে পারবেন বলো ভাই? সম্বল তো ওই বিঘে কয়েক ক্ষেত আর ইস্কুলের চাকরিটি—তাও ইস্কুলের যা অবস্থা, এই লড়াইয়ের ছিড়িকে এক মাস মাইনে পায় তো দু মাস পায় না। এই সব দেখে বুঝে ওঁরা নিজেই যদি আক্কেল করে বাকি সোনাটুকু দিতেন তো আমার আর…"

গাড়ির গতি মন্দ হইয়া আসিতেছে। মেয়েটি একবার গলা বাড়াইয়া দেখিয়া লইল। হঠাৎই মুখটা একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শিশুটি আমার ভাইঝির কোলে ছিল, তুলিয়া লইয়া মুখের পানে চাহিয়া দুইটা চুম্বন করিয়া বলিল, "মামার বাড়ি এসে গেল, খোকন! —দিদিমা—দাদু—মামীমা! সোনাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে …সাধ করে কি লিখি ভাই? এই সোনার অঙ্গে একটু সোনা-দানা না হ'লে চলে?—চলে কখনও—মায়ের প্রাণ কখনও বাঁচে?"

* * * * *

গাড়ি আসিয়া স্টেশনে দাঁড়াইল।

একটি বৃদ্ধ ব্যাকুলভাবে করিতে করিতে এদিকে আসিতেছেন। মেয়েটি শিশুটিকে কোলে লইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। বলিল, "ওই আমার বাবা, ভাই। এই রোদ্দুরে—বুড়ো মানুষ—ঐ কাহিল শরীর..."

স্বরটা হঠাৎ খুবই গাঢ় হইয়া পড়িল। বলিল, "কি দোটানা যে মেয়ের অদেষ্ট ভাই! মাকে চিঠিটা লিখে পর্যন্ত মনটা এত খারাপ হয়ে আছে...থাকলে কি আর দেয় না মানুষে?—কি জানি, তাঁর মনের অভিমান মেটাতে পারব কিনা..."

ছেলে কোলে, বাঁ হাতে আঁচল জড়ো করিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে নামিয়া গেল।

[শনিবারের চিঠি, বৈশাখ ১৩৫২

বাংলা

পুত্র আসিয়া বলিল, "বাবা, কি রকম বোকা দেখ!—রাজপুত-দের মেয়েরা জানত তাদের স্বামী যুদ্ধে মরবে—বিধবা হতে হবে,—তবুও বিয়ে করতে ছাড়ত না।"

তুলোয় মানুষ-করা ডাক্তারের সন্তান। আপাদমস্তক আচ্ছাদনে ঢাকা, আহারও করাইয়াছি নিক্তির তৌলে ভাইটামিন এ-বি-সি-ডির নিখুঁত সামঞ্জস্যে, ওর রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়াছি আলোর ভয়, বাতাসের ভয়, অদৃশ্য কীটাণুর ভয়—মৃত্যুর বিরাট রূপ তো ওর কল্পনারও অতীত।—সেই মৃত্যু যাহা বিরাটতর জীবনের হাতের খেলনা মাত্র, তাহার ধারণা ও কি করিয়া করিবে?

দুঃখের সঙ্গে হাসিও পাইতেছিল। ওকে দিয়াছি রাজস্থানের কাহিনী পড়িতে। আসল দিক্ দিয়া হইতেছে অমানুষ, মানুষ হইবে সাহিত্য-ইতিহাসের পেটেণ্ট ঔষধ গলাধঃকরণ করিয়া?…এদিকেও সেই ডাক্তার।

কিন্তু এর মধ্যেও বাহাদুরী দিতে হয় ওর বিশ্লেষণ-শক্তির। আমার ছেলের পূর্বে সারা রাজপুত-ইতিহাস মন্থন করিয়াও একটা এমন গোটা জাতির মূলগত দুর্বলতার তথ্য কে কবে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে? ভাবিতেছিলাম, কিছুই ভুল হইতেছে না—বাঙালী ডাক্তারের ছেলে, তাহার দৌড় কতদূর? একটা পি-এইচ-ডি কি একটা ডি-এস্-সি-র যে অকর্মণ্য বুদ্ধির সূক্ষ্মতা তো আয়ত্তই হইতেছে উহার।

চিন্তাস্রোতে হঠাৎ বাধা পড়িল। কালু বাগ্দির ছেলেটা পাশের

গলি হইতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাহির হইয়া চোখ দুইটা বিস্ফারিত করিয়া হাত নাড়িয়া শরীর ঝাঁকাইয়া বলিল, "ডাক্তারবাবু, শীগ্‌গির আসুন,—এতক্ষণ বোধ হয় কেল্লা ফতে !…"

ওদের স্তরের ভাষাটাই ওই রকম। প্রশ্ন করিলাম, "কি ব্যাপার ! কেল্লা ফতে কিরে ?"

"এতক্ষণে বোধ হয় টেঁসে গেছে বুড়ী।"

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে উঠিতে প্রশ্ন করিলাম, "কোন্ বুড়ী ? কি হয়েছিল ?"

"আমার দিদিমা বুড়ী গো ! শীগ্‌গির চলো আপনি, হয়নি কিছু ; তবে ওর শরীলে তো আর সামথ্যি নেই—ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে ছাদের ওপর থে যেই ডিগ্‌বাজি খেয়ে পড়া…"

অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল ছাদের ওপর !"

ছেলেটা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া হাত-পা ছুঁড়িয়া বলিল, "সে সাবড়ে গেল, আর তুমি কথা ধরতে পারছনি, ডাক্তারবাবু ? আগে চলো ঝট করে। সে এতক্ষণ নিজেই ঘুড়ি হয়ে ভোঁকাট্টা হয়ে গেছে…"

তাড়াতাড়ি সার্টটা গায়ে দিয়া ফার্স্ট এডের বাক্সটা লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। চলিতে চলিতে প্রশ্ন করিলাম, "ঘুড়ি কে ওড়াচ্ছিল ? খুলে বল্ দিকিনি ব্যাপারটা ?"

ছেলেটা বলিতে লাগিল, "ঘুড়ি ওড়াচ্ছিলাম ফট্‌কে, আমি আর নস্তে। বামুনপাড়া থেকে ভটচায্যি মশায়ের ছেলে একটা আদ্ধা উঠিয়েছে। ওর গুমোর তিবুভূমনে ওর মতন মান্‌জা দিতে আর কেউ পারে না। ফটকে বললে, 'আমি লাগাই প্যাঁচ্'। নস্তে বললে, 'না, ফেলু্‌কে লাগাতে দে, বামনার যা সুতো, তোকে একটা টানে সাবাড় করে দেবে। ফ্যালার বরং নতুন মান্‌জা…' কোন মতেই

শুনবে নি ফটকে—দুলের পো আর কত ভালো হবে?…এই বাঁয়ে দে চলুন, ডাক্তারবাবু, শীতলীর মার উঠোন দিয়ে, টপ্‌ করে হবে…আমি তখন মনে মনে বললাম, 'দাঁড়া,' এই বলে…"

'ডিগবাজি খেয়ে যেই বুড়ীর ঘাড়ে পড়া…'

আসল প্রশ্নের উত্তরের কোন সন্ধান না পাইয়া আমি ধমকাইয়া বলিলাম, "কে পড়ল ছাদ থেকে বল্‌ না? সেটা আছে কি গেছে?"

ফ্যালা আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "সব কথা খুলে বলি, তুমি যে ধরতে পারবেনি না হ'লে।...এই বলে আস্তে আস্তে ঘুড়িটাকে ফটকের ঘুড়ির মাথার ওপর নে গিয়ে এক রামগোঁত্তা দিয়ে ঘাড়ে ফেলব—এমন সময়..."

সরু রাস্তার দুই ধারেই আগাছার বন। হঠাৎ হাততালির সঙ্গে একটা উৎকট চিৎকার করিয়া ফ্যালা দুড়দাড় করিয়া বনের মধ্যে খানিকটা পর্যন্ত ছুটিয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "এক জোড়া গোসাপ ছেল—যেখানেই ওদের দেখবেন ডাক্তারবাবু, জানবেন নির্ঘাৎ কোন স্মুন্দীর পো সাপ আছে কাছে পিঠে—খায় কিনা, ছোটগুলোকে জলখাবার করে, বেশি খিদে পেলে তাগড়া তাগড়া কেউটে, গোখরো..."

বছর দশেকের এ-হেন একটা ডানপিটের সামনে নিজের ভয়টা প্রকাশ হইতে না দিয়া বলিলাম, "তুই চল্ পা চালিয়ে, দুটো লোক মরছে ওদিকে, আর..."

ফ্যালারাম বলিল, "দুটো লোক কে গো? আমার তো কিছু হয়নি, ডিগবাজি খেয়ে যেই বুড়ীর ঘাড়ে পডা, সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে ঘুরপাক খেয়ে..."

আমি একেবারে থ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। ঘুরিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, "তুই পড়েছিলি ছাত থেকে! তুই!!"

পড়ার বিপদটা গ্রাহ্য করিবার ব্যাপার নয়, তাহার লজ্জাটাই যেন সব কিছু—এইভাবে সংকুচিত হইয়া ফ্যালা বলিল, "পড়নু কি অমনি? —ছাতে আলসে দেওয়ার আগেই বাবা গেল অক্কা পেয়ে।...গোঁত্তা খেয়ে ঘুড়িটা ফটকের ঘুড়ির ঘাডে ফেলেছি, এমন সময় ন্যাড়াছাতের কিনেরায় ডিগবাজি খেয়ে নিজেই একেবারে দিদিমা বুড়ীর ঘাড়ে

ঝপ্পাং!···” বলিয়া হাত-পা-কোমর বাঁকাইয়া অকস্মাৎ ঘাড়ে পড়িবার একটা অভিনয় করিয়া খল্‌খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বলিলাম, “তোর লাগেনি?”

“নাঃ”—বলিয়া ফ্যালা কাপড়টা সরাইয়া ডান হাঁটুটা বাহির করিয়া একবার দেখিল। জায়গাটা থেঁতো হইয়া গিয়াছে একেবারে। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, তাহার ধূলিমলিন কালো কুচকুচে পায়ে দুই এক জায়গায় এখনও জমাট রক্তের দাগ, হাঁটুর কাছে ময়লা কাপড়টায়ও শুকনো রক্তের দাগ, অর্থাৎ এক সময় বেশই রক্ত পড়িয়াছিল, এখন ক্ষতের উপর খানিকটা জমিয়া আছে।

ফ্যালারাম বলিল, “এ কিছু নয়, কোমরের কাছটায় বরং খানিকটা ছড়ে গেছেল, ঘাস চিবিয়ে দিয়ে দিয়েনু···”

‘কিছু নয়’ যদি এই হয় তো সেটা যে আবার কি নিদারুণ ব্যাপার —কল্পনা করিতেও শিহরিয়া উঠিলাম। তাড়াতাড়ি একটা অ্যান্টি-টিটেনাস্ ইন্‌জেক্‌শনের ব্যবস্থা করিব, ফ্যালা হঠাৎ সচকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, “তুমি এগোও ডাক্তারবাবু, মোড়ল-জ্যাঠা আবার কাজে বেরিয়ে যাবে, যদি চালির জোগাড় করতে হয়, বলে এসিগে; এক্কেবারে ভুলে গেছনু...”

বাধা দিবার পূর্বেই পাশের একটা বাড়ির ছেঁচতলার নিচে দিয়া, উঠান বাহিয়া, গোয়ালঘরের পাশ দিয়া ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

আমি এই বাংলারই আর একটা রূপ দেখিয়া বিস্মিতভাবে একটু দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর হন্‌হন্ করিয়া কালু বাগ্‌দির বাড়ির পানে চলিলাম।

আসল বিস্ময়ের তখনও বাকি। গিয়া দেখি কালুর বাড়ির পিছনের

দিকটায় অনেক মানুষের জটলা, বেশিভাগই স্ত্রীলোক ; তাহাদের মাঝখানে হাতে একটা বাঁখারি লইয়া প্রায় সত্তর বৎসরের একটি বৃদ্ধা চিৎকার করিয়া পাড়া মাথায় করিতেছে। কালো কুচকুচে গায়ের রং, মাথার চুল যেন শনেরনুড়ী, দীর্ঘ, ঈষৎ ন্যুব্জ শরীর, বয়সের আধিক্যে মেদ লুপ্ত হইয়া শরীরের পলিত চর্মের নিচে মোটা হাড়, সুপুষ্ট শিরা ও পেশীগুলাকে স্পষ্ট করিয়া জাগাইয়া দিয়াছে।

বুড়ী গগন ফাটাইয়া চিৎকার করিতেছে, "সে হাভাতে গেল কোথাকে ?...তোরা এতগুলো নোকে হদিস করতে পারলি নি ?—ঘুড়ি ওডাবে ? ঘাড়ে পডবার লোক পেলেনি আর ? বেতো মনিষ্যি, একেবারে চুরচুর করে দিয়েছে গতর ?..."

ফ্যালার দিদিমাকে আমি দেখি নাই। তাহার বাড়ি বড় নদী অর্থাৎ দামোদরের পারে—অনেক দূরে ওদিকে কোথায় ; জামাই মারা যাইতে সম্প্রতি মেয়ের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আসিয়াছে।

আমি আসিতেই সবাই সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিয়াছিল, খানিকটা ভিতরে গিয়া অনির্দিষ্টভাবে সবার উপর একবার চোখ বুলাইয়া প্রশ্ন করিলাম, "কোথায় সে ?"

অর্জুন গুঁই সামনে আসিয়া একটা প্রণাম করিয়া বলিল, "এজ্ঞে, সে তো পালিয়েছে, তারা তিনোজনাই। ফ্যালারাম গেছে খুঁজতে তাদেরকে।"

দুলে-বাগ্‌দি পাড়ার কাণ্ড, সবই যেন বিটকেল। বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "আরে তার কথা নয়, সে তো বেঁচে গেছে, আমায় ডেকেও আনলে তো সেই। আমি বলছি জখমীর কথা—যে বুড়ীটার ঘাড়ে পড়েছে..."

বুড়ী চুপ করিয়াছে, আমার দিকে একটু আগাইয়া আসিয়াছে।

অর্জুন এবং তাদের সঙ্গে আরও কয়েকজন বুড়ীকে দেখাইয়া এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "সে তো ঐ আপনার পাশেই গো!"

আমি স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিলাম, বাক্‌স্ফূর্তি হইল না। বুড়ী চিবাইয়া চিবাইয়া ঘাড নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "তোমায় ডেকে দিয়েছে? আবার ডাক্তার ডেকে ঠাট্টা! সে আবাগীর পুত নিজে আসুক না, ডাক্তার কার দরকার হয় দেখাই একবার? ঠাট্টা!... নিশ্চিন্দি হয়ে দুটো গিমে শাক তুলচি, হুড়মুড়িয়ে নাটাই শুদ্ধ্যু একেবারে ঘাড়ের ওপর গা! গতর থেঁতো করে দিয়েছে একেবারে!..."

আমার ডাক্তারি বিবেক ত্রস্ত হইয়া উঠিল। উপরে চিহ্ন না থাকিলেও ভিতরে ভিতরে তাহা হইলে নিশ্চয় মোক্ষম চোট লাগিয়াছে, —ইন্‌টার্নাল্ হেমারেজ—সে তো আরও সাংঘাতিক ব্যাপার! বলিলাম, "চলো দিকিন, দেখি কোথায় লাগল চোটটা..."

ডাক্তারি প্রথামত রোগীকে সান্ত্বনা দিতে যাইতেছিলাম, বুড়ী ঝাঁঝিয়া উঠিয়া বলিল, "তুমি আর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিওনি বাপু! আজ তিন কুড়ি বছর ধরে এই কোলে পিঠে করে আপন পরের মিলিয়ে দু'কুড়ি ছেলেমেয়ে মানুষ করনু, আর আজ একটা কোত্থেকে ছেলে একটু ঘাড়ে পড়েছে...কিন্তু সে দজ্জাল, ডানপিটে গেল কোথায় বললে নি তো! গেল কোন্ ভাগাড়ে?..."

সে যে ইহাকেই লইয়া যাইবার জন্য বাঁশের চালির ব্যবস্থা করিতে গিয়াছে—এ সংবাদ দিবার কোন তাড়া ছিল না।—

সেই জন্যও, এবং মুখের কথা প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল—এজন্যও, আর কিছু না বলিয়া কতকটা অপ্রতিভভাবেই ভিড়ের মধ্যে দিয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

[সংহতি, আশ্বিন ১৩৪৬]

কতয় হ'ল ?

বাঙালী হইলেও বাংলাদেশ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা খুব কম। বাহিরেই জন্ম, তাহার উপর সামরিক বিভাগে কাজ লইয়া বরাবর বাহিরে বাহিরেই কাটিয়াছে। সম্প্রতি কিছুদিনের জন্য বদলি হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছি। লড়াইয়ের জন্য বাড়ির অকুলান, কলিকাতার বাহিরেই একটা বাসা লইয়া আছি, ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করি।

মেওয়ার দেশেই বেশিটা দিন কাটিল, এখানে আসিয়া ফল খাওয়ার বিশেষ অসুবিধা হইতেছে,—শুধু আমারই নয়, বাড়ির ওঁদেরও। কতকটা নিজের তাগিদে, কতকটা তাগাদায় একটু সকাল সকাল ছুটি লইলাম, আমার আবার ছোট লাইন, শেষ গাড়ি সাতটা তেরোয়, অফিস হইতে একরকম ছুটিয়া গিয়া ধরিতে হয়।

বাংলাদেশের বাজারে এর আগে প্রবেশ করি নাই—বড় কৌতুক-জনক বোধ হইল,—ঝিঙে, পলতা, সুশনি, থোড়, মোচা—আমাদের ওদিককার 'সব্‌জি-মণ্ডি' হইতে কত আলাদা। অনির্দিষ্টভাবে একটু ঘুরিয়া বেড়াইয়া ফলের কাটরাটায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম, এমন সময় কানে গেল, "ইলিশ মাছ—টাটকা ইলিশ! চলে এসো, ফুরিয়ে গেল বলে...।"

যেখানটা দাঁড়াইয়াছিলাম তাহারই সোজাসুজি ও-প্রান্তে মাছের কাটরা, দেখি আধাবুড়ী গোছের একটা মেছুনী গোটা কতক মাছের উপর জল আছড়াইয়া হাঁকাহাঁকি করিতেছে। আমি দাঁড়াইয়া

পড়িলাম এবং আমার চিন্তার ধারা হঠাৎ একটু এলোমেলো হইয়া গেল। বাংলাদেশের বাজারে আসিয়া মাছ ছাড়িয়া আখরোট, বেদানা, খোবানি, আক্সির কেনা আমার কাছে হঠাৎ বড় বিসদৃশ ঠেকিল—তাও আবার ইলিশ মাছ, বাংলার একেবারে নিজের ছাপমারা জিনিস!

গিয়া একটি কিনিলাম, ওজন সের দেড়েকের কিছু ওপর হইল; তিন টাকা করিয়া সের। মেছুনী নিজের কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, "আজ কার মুখ দেখে যে উঠলুম বাবা, কেবলই নোকসান দিয়ে মরচি—কেবলই নোকসান দিয়ে মরচি—এই মাছ পাঁচ ট্যাকা করে বেচচে আবাগীরা—এই বাজারেই…"

ল্যাজা মুড়ো একটা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া আমার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, "নে যাও এই এরকম করে টাঙো…"

বলা বাহুল্য মেওয়া কেনা আর হইল না।—একদিনেই পাঁচ টাকার মাছ কিনিয়া মেওয়ার জন্য হাত বাড়াইবার মতো অবস্থা নয়।

বাজার থেকে বাহির হওয়ার মুখে একটা বেনেমসলার দোকান পড়ে। সামনে একটা তেপাইয়ে একজন বৃদ্ধ তামাক খাইতেছিল, একটু আড়ে দেখিয়া প্রশ্ন করিল, "কতয় হ'ল বাবুর উটি?"

বলিল, "চার টাকা স' তেরো আনা।"

"চার টাকা স' তেরো আনা—একটা মাছ!…দিন কতক পরে মাছ আর লোকে চোখেই দেখতে পাবে না।"

একটু আলোচনাও তুলিয়াছে, তাহার উপর হুঁকা মুখে এমন সতৃষ্ণ নয়নে মাছটার পানে চাহিয়া রহিল যে, চলিয়া যাইতে আমার পা উঠিল না। উপর হইতে দোকানি বলিল, "ইলিশ মাছ যে,' সেটাও

দেখতে হবে তো···আর এদিকে সের দু'এক বোধ হয় হবেও, কি বলেন ?"

বলিলাম, "হ্যাঁ, কাছাকাছি যায়।"

বৃদ্ধ হুঁকা টানিতে টানিতেই আবার একটু ভালো করিয়া দেখিয়া বলিল, "তা হবে বৈকি সের দু'এক। কি দর হ'ল ?"

বলিলাম, "তিন টাকা করে।"

বৃদ্ধ বার তিনেক কাসিয়া বলিল, "ন্যাও! মিথ্যে বলছিলুম ? আর আমাদের সেকালে এই মাছ গাঁদি করা পড়ে থাকত—দু আনা, তিন আনা—বড়জোর চার আনা মাছটা। সেই মাছ এখন মেওয়া হয়ে উঠেছেন, নাম করতে তোমাদের মুখে জল আসে!"

নিজের মুখেই অতিরিক্ত জল আসিয়া পড়ায় একটা ঢোঁক গিলিয়া আবার হুঁকা টানিতে লাগিল।

আমি আর অপেক্ষা করিলাম না। বাজার আর বাহিরের ফুট-পাথের মধ্যে একটা লম্বা খিলান পড়ে, তাহারই নিচে দিয়া রাস্তা। খানিকটা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, পিছনে প্রশ্ন হইল, "কতয় হ'ল শেষ পর্যন্ত ?"

ফিরিয়া দেখি একজন মাঝ-বয়সী ভদ্রলোক—মোটাসোটা শরীর, মোটা গোঁফ, গায়ে চীনে কোট, হাতে একটা বাজার-করা থলে।

বলিলাম, "চার টাকা স' তেরো আনা ; তিন টাকার দরে নিলে।"

"আমি আড়াই টাকা পর্যন্ত উঠেছিলাম, তার বেশি—আরে দ্যুৎ! —তা ভিন্ন বিকেলের চালান। দেখে নিয়েছিলেন তো ভালো করে ?"

আড়ে মাছটার পানে চাহিয়া, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আগাইয়া গেলেন।

'নে যাও এই এরকম করে টাঙো'

মনটা একটু দমিয়া গেল। এত দর দিয়া কেনা মাছটা শেষ পর্যন্ত দো'রসা হইবে নাকি? বুড়ী কান্‌কো দুইটা তো দেখাইয়া দিল, বেশ টকটকে লাল। আবার শুনিয়াছি এখানে কানকোয় রং দিয়া মাছ বিক্রয় করে..."নাঃ" বলিয়া কয়েক পা আগাইয়া কিন্তু আর মনের জোর রহিল না, একবার চট করিয়া চারিদিকে দেখিয়া লইয়া মাছটা একটু নাকের কাছাকাছি লইয়া গেছি, একটা ধাক্কা লাগিয়া হাত থেকে ছিটকাইয়া পড়িল।

সামনেই ব্যাফ্‌ল্‌ ওয়াল্‌, একটা লোক হন্তদন্ত হইয়া ভিতরে আসিতেছিল। রোগা ডিগডিগে সদাব্যস্ত গোছের এক শ্রেণীর লোক আছে, এও সেই রকম বলিয়া মনে হইল; এরা মনে করে, এদের পথ সর্বদাই পরিষ্কার, তাই সর্বদাই এদের অপরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়, কোন কিছুর আড়াল থাকিলে ঠোকাঠুকি তো অনিবার্য।

বলিল, "সরি!"

তাহারপর মাছটার উপর নজর পড়ায় আমার আগেই সেটা তুলিয়া লইয়া ঝোঁকের মাথায়ই আমায় ফিরাইয়া দিতে যাইবে, হঠাৎ একেবারে শান্ত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল; মাছটা তুলিয়া ধরিয়া প্রশংসার দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "ইলিশ মাছ বাজারে এসেছে নাকি মশাই? কি দর হ'ল? সের দেড়েক হবে দেখছি······ব্যাটা অ্যামেরিক্যান্‌দের দিষ্টি এড়িয়ে ঢুকলো কি করে এ-বাজারে?"

কোন্‌ প্রশ্নটার উত্তর দিব ভাবিতেছি, হঠাৎ আমার পানে চাহিয়া বলিল, "এই একটি ছিল?"

উত্তর করিলাম, "না, এখনও আছে আরও কিছু বোধ হয়।"

"বোধ হয়!"—বলিয়া তাড়াতাড়ি মাছটা একরকম আমার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়াই বাজারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আমি চুপ করিয়া সেই ব্যাফ্‌ল্‌ ওয়ালের আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে হইল একটা মস্ত বড় সমস্যার সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছি। আমরা বাঙালীরা পৃথিবীর অন্যতম মৎস্যপ্রিয় জাতি বলিয়া জানা আছে, কিন্তু সেটা যে এ-ধরণের কিছু একটা এ জ্ঞান ছিল না। বৃদ্ধের সতৃষ্ণ কাতর দৃষ্টি, স্থূল ভদ্রলোকটির সেই ঈর্ষা, তাহার পর এর এই গেল-গেল ভাব—আমার সামনে স্বজাতির যেন একটা নূতন রূপ প্রকাশ করিয়া ধরিল। যাক্, আমি আবার যে প্রবাসী সেই প্রবাসী হইব; কিন্তু এখন এই প্রশ্ন-অভিমত-মন্তব্যের বান ঠেলিয়া বাসায় পৌঁছাই কি করিয়া? মাছের কাটরা থেকে বোধ হয়, শতপদও আসি নাই, এর মধ্যেই তিনটি হইল। এটা লেক-মার্কেট, আর আমার যাইতে হইবে মাঝেরহাট স্টেশনে, সেখানে ফলতা-কালীঘাটের ছোট লাইন ধরিয়া আরও দুইটা স্টেশন।...এই রেটে যদি প্রশ্ন চলিতে থাকে, স্টেশনে যে পৌঁছাইতেই পারিব না।

আড়াল থেকে বাহির হইতে সাহস হইতেছে না। মাছটা পিছনে করিয়া একটু চিন্তা করিয়া লইলাম; একেবারে এখান থেকেই ট্রামে উঠিয়া পড়ি? কালীঘাট ডিপোয় বদল করিতে হইবে—এই তো দেড় গজ পথ—এর জন্য এক আনা আদায় করিয়া লইবে কিন্তু!...হঠাৎ মাথায় আসিল—বড় রাস্তা ছাড়িয়া গলি-পথ ধরি। ঠিক গলি না হইলেও অনেকটা নিরিবিলি; তাহার পর কালীঘাট পার্কের মধ্য দিয়া একেবারে ডিপোর সামনে!...আর ঠিক করিলাম অত সওয়াল জবাবের মধ্যে থাকা চলিবে না; বেশ পা চালাইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যাই।

সওদাটি বেশ বাগাইয়া ধরিয়া পা চালাইয়া বাহির হইতেই একটি শোলের ঝাঁকের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। একজন বৃদ্ধ, গায়ে

বালাপোষ, দিব্য টুকটুকে চেহারাটি, অবস্থাপন্ন বলিয়া মনে হয়—সঙ্গে সাত আটটি কচিকাচা, রং-বেরঙের জামা পরা—সবগুলিই বছর সাতেকের নিচে। খুব সম্ভব সকলে দাদুর সঙ্গে বায়ু সেবন করিতে বাহির হইয়াছে।

হঠাৎ ঝোঁকের উপর দেয়ালের পিছন হইতে বাহির হওয়ায় একটি ছেলে একটু ধাক্কা লাগিয়া প্রায় পড় পড় হইয়াছিল, সামলাইয়া লইলাম। বৃদ্ধ একেবারে উগ্র হইয়া উঠিলেন, কিন্তু ভদ্রলোক দেখিয়া তখনই নিজেকে অনেকটা সংযত করিয়া লইলেন; তবু একটু মুখ বিকৃত করিয়াই কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় দৃষ্টিটা মাছের উপর পড়িল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিকৃতির রেখাগুলা মুছিয়া গিয়া মুখটা প্রসন্ন হইয়া উঠিল; মাছের উপর কয়েক সেকেণ্ড দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ইলিশ মাছ?—কতয় হ'ল?"

অপরাধী, সুতরাং না উত্তর দিবার প্রতিজ্ঞাটা আর রক্ষা করা চলিল না। ছেলেটির মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে মাছটি একটু তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম, "আজ্ঞে, দাম নিলে একটু,—চার টাকা সওয়া তেরো আনা—তার কমে ছাড়লে না।"

"দোষ দিতে পারেন না—ইলিশ মাছ যে! মিলিটারি বেটাদের এড়িয়ে আর পাওয়ার জো নেই তো? একেবারে স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

দুই পা আগাইয়া আসিয়া মাছটার পানে চাহিয়া গল্প জুড়িয়া দিলেন; সমস্ত দলটি আমায় ঘিরিয়া ঊর্ধ্বমুখ হইয়া দাঁড়াইল। লোকেরা এটুকু ফুটপাথ হইতে নামিয়া নামিয়া যাইতে লাগিল। তাহারই মধ্যে কয়েকজন আবার একটু ঘুরিয়া জিজ্ঞাসাও করিয়া লইল—কতয় হইল মাছটি।

বৃদ্ধ বলিলেন, "আপনি পেয়ে গেছেন, এ মাছ এবার তো দেখতেই পাওয়া গেল না, আপশোষের কথা বলেন কেন?…ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা রয়েছে, এখন স্রেফ্‌ খিচুড়ি-আর-ইলিশ-ভাজা!…না, দিব্যি মাছটি পেয়েছেন।…তাহ'লে, আসছে আজকাল বাজারে? চাকর বেটাকে রোজ বলি, একটু নজর রাখবি—ভেটকি এনেছে দুদিন, আজ এই তিন দিন থেকে গলদাও আনছে—ওটাও ডুমুরের ফুল হয়ে দাঁড়িয়েছিল কিনা—বেটারা যে কবে যাবে মশাই, জ্বালিয়ে মারলে…গান্ধী বললে না?—'তোমরা লুট করে নিয়েছ—ফেমিন আর না হয়ে পারে?'—উনিশ তারিখের কাগজটা দেখবেন উল্টে—লাখ কথার এক কথা বলেছে মশাই—গবর্ণমেণ্ট পেন্‌শনার বলে ন্যায্য কথাটা মানব না?… ঘি গেল, দুধ গেল—বাঙালীর সম্বল ছিল মাছ, তাও…আপনার দেরি করিয়ে দিচ্ছি, কোথায় যেতে হবে?…"

মুখে নিজের অজ্ঞাতসারেই বোধ হয় অধৈর্যের চিহ্ন কিছু কিছু ফুটিয়া উঠিয়াছিল, একটু কুণ্ঠিতভাবেই হাসিয়া বলিলাম, "আজ্ঞে, যেতে হবে সেই সখের-বাজার—ফলতা লাইন।"

"অনেকটা যে! একটু বরফের ব্যবস্থা করে নিলে হ'ত না?"

বেশ একটু চিন্তিত হইয়া উঠিলেন।

বলিলাম, "সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি পেয়ে যাব।"

"তাহলে যান…দেরি করবেন না।…তোরা পথ ছেড়ে দে দিকিন—ঘাড়ে গিয়ে পড়বি তো আবার…"

রাস্তার মাঝামাঝি গেছি, আবার ডাক দিলেন, "শুনুন!…দর কি নিলে?—জিগ্যেস করে রাখি; চাকরের হাতেই সব তো?"

বলিলাম, "তিন টাকা।"

"নিন্দের হয়নি; ইলিশ মাছ কি না, সেটা দেখতে' হবে যে

আবার।" একটু হাসিয়া বলিলেন, "সওয়া তের আনা বললেন না? মানে একটা পয়সা—তাও ছাড়লে না!...ছাড়বে না তো, ইলিশ মাছ যে!"

এমন করিয়া বার-বার মাছের নামটা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, মনে হইল যেন ঐটুকুতেই জিভে অনেকটা স্বাদ পাইয়া যাইতেছেন।

গলির মুখে একবার ফিরিয়া দেখিলাম, মনে হইল এই দিকেই চাহিয়াছিলেন এতক্ষণ, তখনই মুখটা ঘুরাইয়া লইলেন।

গলিতে প্রবেশ করিবার অল্পক্ষণ পরেই টের পাইলাম—বড় ভুল হইয়া গেছে। বড় রাস্তার একটা সুবিধা—দুদিকে দোকানপাট, লোকেরা কেনাবেচা লইয়া ব্যস্ত। অকাজের লোকও আছে, তবে নিশ্চয় কম। এখানে তো দু'পা চলা মুস্কিল হইয়া উঠিল। সকলেই বৈকালিক অবসর উপভোগ করিতেছে—কেহ বাহিরের রকে বসিয়া চায়ের কাপ হাতে, কেহ সামনের বৈঠকখানায় গড়গড়া টানিতে টানিতে; কেহ একা, কোথাও দুইজন, কোথাও ততোধিক।—অস্থির হইয়া গেলাম। শ'খানেক গজের বোধ হয় বেশি নয় গলিটা, কিন্তু তাহার মধ্যেই আমার নয়-দশ জায়গায় 'কতয় হ'ল'-র উত্তর দিতে হইল; সংক্ষেপে সারিবার চেষ্টা করিয়াও দু'এক জায়গায় খানিকটা একটু বিস্তারিত প্রশ্নোত্তরে পড়িয়া যাইতেই হইল। মাথা খারাপ হইয়া আসিতেছে যেন। ঘড়ি দেখিতেছি—গতিবেগ বাড়াইয়া দিতেছি, তাহার পরই আবার প্রশ্ন। একটা বাড়ির রকে পাশের দুই তিন বাড়ির অনুসন্ধিৎসু বৃদ্ধ-প্রৌঢ়ে প্রায় জন ছয়-সাত জড়ো হইয়া মাছেরই আলোচনা লাগাইয়াছিল, সেই আবর্তের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। যেন দিশাহারা করিয়া তুলিল! রকমারি প্রশ্ন—সবাই আগে উত্তর চায়। ইলিশ মাছ লইয়া সদ্য বাজার হইতে আসিতেছি—একজন

অথরিটি যে! আর অগ্রসর হইতে সাহস হইল না, এ-গলিটা গিয়া যে রাস্তায় পড়িয়াছে, এক রকম গলা বাড়াইয়া তাহার যতটা পারা গেল দেখিয়া লইলাম—হয়তো আমার শঙ্কিত দৃষ্টির জন্যই মনে হইল, প্রশ্নার্থীর সংখ্যা যেন আরও বেশি। আরও একটু ভিতরের দিকে গিয়া ফিরিলাম।

"ফিরলেন যে?"

"দেখছি ভুল পথে এসেছি।"

"যেতে হবে কোথায়?"

"চিলড্রেন্‌স্ পার্কের পাশ হয়ে..."

"ও! তাহ'লে উল্টো এসেছেন বৈকি।...মাছটা সওয়া পাঁচ টাকায় হ'ল বললেন না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—হন হন করিয়া পা চালাইয়া শ্বাস রুদ্ধ করিয়া প্রায় অর্ধেকটা অতিক্রম করিয়া ফেলিলাম—

"হাতে-পাঁজি মঙ্গলবার, এই নাও, ইনিই এক্ষুণি বলে গেলেন, মাছও ঐ হাতেই রয়েছে।...কি মশাই সওয়া চার টাকা সেরই বললেন না?"

"হ্যাঁ।"

"ঐ শোন।...পাঁচ টাকা—দশ টাকা পর্যন্ত ইলিশ মাছ বিক্রি হয়ে গেছে...পড়তে পায়?—অ্যামেরিকানদের দালালরা ঘাঁটি আগলে বসে আছে।...ভদ্দর লোক যদি না ফিরতেন তো..."

কতকটা তর্কের গোলমালে, কতকটা দূরত্বের জন্য আর শোনা গেল না। বাহিরে আসিতেই সঙ্গে সঙ্গে একটা ট্রাম পাওয়া গেল; আর অত হিসাব না খতাইয়া উঠিয়া পড়িলাম।

রাস্তার চেয়ে ট্রামের অসুবিধা এই যে এখানে হাতকয়েকের মধ্যেই একেবারে অনেকগুলি—প্রতি স্টপেজেই নূতন আমদানিও হইতেছে, আর তাহাদের মাছ সম্বন্ধে একেবারে সন্থ খবর সংগ্রহ করা ভিন্ন কোন কাজই নাই।···মিনিট পাঁচেকও লাগিল না বোধ হয়, কিন্তু ঐটুকুতেই উত্তর দিতে দিতে গলা যেন কাঠ হইয়া গেল।

যখন ট্রাম থেকে নামিলাম, মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। কপালের ঘাম মুছিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া লইলাম। ট্রামে করিয়া যাওয়া চলিবে না, গলিও বন্ধ; কি করিব ভাবিবার সময়ও পাইতেছি না, "কতয় হ'ল?"—আবার সুরু হইয়া গেছে। হঠাৎ সামনের শিখেদের হোটেলগুলার দিকে নজর পড়িল, কালীঘাটের রাস্তার মাথায়ই ওদের একটা বেশ বড় আড্ডা আছে। একটু নির্ঝঞ্ঝাটে দাঁড়াইয়া চিন্তার অবকাশের জন্য পা বাড়াইয়াছি, এমন সময় টুং টুং শব্দ করিতে করিতে একটা রিক্সা দুইজন আরোহী লইয়া সামনে দিয়া চলিয়া গেল। আমার সমস্যাও মিটিয়া গেল।...এতক্ষণ এই সামান্য জিনিসটার কথা কেন যে মনে পড়ে নাই!

খানিকটা দূরে খালি আর একটা আসিতেছিল, হাঁক দিলাম। ঘড়িটা একবার দেখিয়া লইলাম—সময় আছে এখনও, রিক্সাটা আসিলে তাড়াতাড়ি চড়িয়া লইয়া লোকটাকে বলিলাম, "সামনে। মাঝেরহাট স্টেশন।"

লোকটা আমার দিকে একটু বিস্মিতভাবেই চাহিল; মোট নাই, কিছু নাই, ট্রাম-বাস ছাড়িয়া মানুষটা রিক্সা করিয়া মাঝেরহাট যায় কেন!···বলিল, "দেড় টাকা লাগবে বাবু।"

বলিলাম, "একটু জোরে চল্।"

কী যে স্বস্তি বলিয়া কুলাইতে পারি না! রাজপথের বুকের উপর দিয়া যাইতেছি, লোক চারিদিকে গিজ-গিজ করিতেছে—কত রকম লোক! কিন্তু মাছ সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন নাই। টুং টুং করিয়া একটু দুলিতে দুলিতে পথ বাহিয়া চলিয়াছি; নিশ্চিন্ত! সামনের গলির ভিতর হইতে দুইজন লোক বাহির হইয়া আসিল গল্প করিতে করিতে; একজনের হাতে একটা বাজার-করা থলে, আর একজনের হাতে মাছ কিনিবার একটা লোহার খাঁচা। গোঁফ দেখিলেই বোঝা যায় মাছের যম, যদি আমায় মাছ হাতে হাঁটিয়া যাইতে দেখিত, ঝাড়া পনের মিনিট তো আটকাইয়া রাখিতই। তাহার নাকের সামনে দিয়া নির্বিঘ্নে চলিয়া যাইবার সময় মনটা যেন ছেলেমানুষের মতোই পুলকিত হইয়া উঠিল।

হাজরা রোডের মোড়ে আসিয়া একটু বাধা পড়িল। মিলিটারি লরীর শ্রেণী যাইতেছে, পথ বন্ধ। দেরি হইবে। ঘড়িটা দেখিয়া লইলাম; লোকটা যাইতেছে ভালো, ক্ষতি হইবে না। মনটা এত হালকা বোধ হইতেছে যে ক্ষতি-বৃদ্ধির কথা অত ভাবিলামও না। দেশলাইয়ের বাক্সয় বেশ নিশ্চিন্তভাবে কয়েকবার ঠুকিয়া লইয়া একটা সিগারেট ধরাইলাম। এতক্ষণে যেন মনে করিবার ফুরসৎ হইল যে একটা মাছ কিনিয়াছি—ইলিশ মাছ—আর তা' আমার ভোগের জন্যই, প্রশ্নে-প্রশ্নে জর্জরিত হইবার জন্য নয়।...কি ব্যবস্থা করা যাইবে?—ভদ্রলোক যেমন বলিলেন—খিচুড়ি দিয়াই প্রশস্ত নাকি?...যাক্, আমার স্ত্রী যোগ্য ব্যবস্থাই করিবেন; বাহিরে-বাহিরে কাটিলেও তিনি বাগেরহাটের মেয়ে, নোনা জলের মাছের তোয়াজ সম্বন্ধে তাঁহাকে আর কলিকাতার লোকের কাছে শিক্ষানবিশি করিতে হইবে না!

অসীম প্রীতির দৃষ্টিতে মাছটির দিকে চাহিয়া রহিলাম—এই একটু

আগেই ভাবিতেছিলাম, কোথায় ফেলিয়াও যদি পালাইতে পারি তো নিষ্কৃতি পাই।...মাছটা নিচে পায়ের কাছে রাখিয়াছিলাম, কি মনে করিয়া যন্ত্রের সহিত তুলিয়া পাশে সীটের উপর রাখিতে যাইব, বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল।

"কতয় হ'ল মশাই?"

এখানেও! ফিরিয়া দেখি আমার পাশেই, একটু পিছনের দিকে কখন আর একটি রিক্সা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর তাহার উপর হইতে একজন খুব মোটাসোটা গোছের মাঝবয়সী ভদ্রলোক মোটা চশমার ভিতর দিয়া করুণ দৃষ্টিতে মাছটির পানে চাহিয়া আছেন। আমি ফিরিয়া চাহিতে আবার বলিলেন, "জিগ্যেস করছিলাম— কতয় হ'ল?"

বলিলাম, "চার টাকা সওয়া তের আনা।"

ভদ্রলোক ঠোঁট দুইটা হঠাৎ কুঞ্চিত করিয়া লওয়াতে ভারি মুখের মাংসগুলা যেন এক জায়গায় তাল পাকাইয়া গেল। কতকটা মুখ-ভ্যাংচানো গোছের দেখিতে হইলেও বুঝিলাম ওটা ওঁর নিরীহ মুদ্রাদোষ বোধ হয়, অতি বিস্ময়ের ঝোঁকে আপনিই আসিয়া পড়ে।

প্রশ্ন হইল, "ওজনে কতটা হ'ল?"

"এক সের পৌনে দশ ছটাক।"

মনে হইল, কোথাও গণিতের শিক্ষক, প্রোফেসারও হইতে পারেন। সেকেণ্ড কয়েক ভাবিয়া বলিলেন, "তিন টাকার দরে।"

বলিলাম, "হ্যাঁ।"

মাংসগুলা আবার সেই রকম এক জায়গায় জড়ো করিয়া লইলেন।

"তা হোক্ গে, ইলিশ মাছ আজকাল পাওয়াই যায় না।"

আমি আর কিছু বলিলাম না, তবে অন্যতর কণ্ঠে উত্তর হইল, "না, আজকাল যাচ্ছে তো পাওয়া মাঝে মাঝে—তবে কম। ওঁর ওটি কতয় হ'ল ?...কতয় হ'ল মশায় ?"

ফিরিয়া দেখি তাঁহার ঠিক পিছনে আর একটা রিক্সা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং আরোহী একটু গলা উঁচাইয়া মাছটি গভীর অভিনিবেশে নিরীক্ষণ করিতেছেন। পাশেই তাঁহার স্ত্রী—আমি চাহিতেই মুখটা ফিরাইয়া লইলেন।

আবার আমার কপালে স্বেদবিন্দু জমিয়া উঠিল, তবে সুখের বিষয় ঠিক এই সময় ভিড়টা সচল হইল ; ট্রাফিক পুলিশ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

হাজরা রোডে পড়িয়া একটু অগ্রসর হইয়াছি, পিছনে প্রশ্ন হইল, "কোন্ বাজারে কিনলেন ?"

ফিরিয়া দেখি সেই গণিতজ্ঞ ভদ্রলোক ; গুরুত্বের জন্য পিছাইয়া গিয়া থাকিবেন, বাহক সম্ভবতঃ তাঁহার আদেশেই আবার আমার পিছনে আনিয়া ফেলিয়াছে। বলিলাম, "লেক মার্কেটে।"

"লেক মার্কেটে ?...তাহ'লে আসছে আজকাল ?"

নিষ্প্রয়োজন হিসাবে আর উত্তর দিলাম না।

"ভেট্‌কি দেখলেন নাকি ?"

"কৈ না তো।"

"গলদা ? আমাদের ওদিকে এটাও পাওয়া যাচ্ছে না কিনা। শুনলাম, রোববারে এসেছিল, তা পৌছুতে পৌছুতেই..."

হাঙ্গাম মিটাইবার জন্য মিথ্যাই বলিলাম, "কৈ, গলদাও তো চোখে পড়ল না।"

"আপনি বোধ হয় ভালো করে লক্ষ্য করেন নি ; সব মাছ আসছে, আর গলদা আসবে না—এ নাকি একটা কথা !"

এ আবার এক নূতন উপদ্রব। যেন চটাচটা ভাব বোধ হইল, দুইবার 'না' বলিলাম বলিয়া নাকি? আমি চুপ করিয়াই রহিলাম।

"ও-বাজারে গলদার রেট-টা কি যাচ্ছে শুনলেন?"

মনের বিরক্তি চাপিয়া একটু বিনীতভাবেই বলিলাম, "আজ্ঞে না, মাছই দেখলাম না, রেট জিগ্যেস করে কি করব?"

"কি করবেন, সে-কথা হচ্ছে না তো। জানা থাকলে উপকার হ'ত একটু। মানে, আমাদের ওদিকে ন'সিকে, আড়াই টাকা যাচ্ছে —অবিশ্যি পাওয়া গেলে; এদিকে সস্তা হলে, এদিক থেকেই নিয়ে যাই, টালিগঞ্জ থেকে আসি, লেক মার্কেট আর কতদূর বলুন না?— এরকম উপকার কি করে না মানুষে মানুষের জন্যে? তবে আর এত কষ্ট করে সমাজ গঠন কেন?"

এ ধরণের কথার আর কি উত্তর দেওয়া যায়? একটা কথা ভাবিয়া প্রশ্ন করিলাম, "টালিগঞ্জেই কাজ করা হয়?"

সংক্ষেপে উত্তর হইল, "রেটসে (Rates-এ)।"

অত তিরিক্ষি ভাব কেন বোঝা গেল;—রেট-কষা মাথা! মাছের প্রশ্ন এড়াইবার জন্যই প্রশ্ন করিলাম, "যাবেন কোথায়?"

"মনসাতলা।"

মনে মনে শিহরিয়া উঠিলাম—সমস্ত আলিপুরটা এইভাবে কাটাইতে হইবে? রাস্তা একটু ফাঁকা হইয়া আসায়—রিক্সাওয়ালাটা আবার ভদ্রলোককে আমার পাশাপাশি আনিয়া ফেলিয়াছে—ভাবিল বোধ হয় দুইজনে দিব্য আলাপ করিতে করিতে চলিয়াছি—একটু সুযোগ করিয়াই দিক না।...খালি মাছ আর মাছ—তোপসে, ভেটকি, ইলিশ, গলদা-চিংড়ি, ঘুষোচিংড়ি—বিভিন্ন বাজারে তাহাদের বিভিন্ন দর— বিভিন্ন রন্ধন প্রণালী—আমার আর কোন পদার্থ রাখিল না। নিরুপায়

অবস্থাতেই মাথায় একটু বুদ্ধি খেলিয়া গেল। রিক্সাটা পুলের চড়াইয়ে উঠিতে যাইতেছিল, লোকটাকে বলিলাম, "দাঁড়া।"

ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন, "আপনার এই পর্যন্ত নাকি?"

বলিলাম, "হ্যাঁ।"

"দিব্যি গল্প করতে করতে যাচ্ছিলাম..."

বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই ঝোঁকে খানিকটা এগিয়েও এসে পড়েছি।"

একটু আগাইয়া গিয়া ফিরিয়া বলিলেন, "কতয় হ'ল বললেন— চার টাকা সওয়া তেরো আনা না?...তা ঠকা হয়নি। আর পেটে ডিম আছে—নির্ঘাৎ—দেখে নেবেন বরং..."

প্রশংসার দৃষ্টিতে মাছটির পানে ঘাড় বাঁকাইয়া চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর দূরত্বটা বাড়িয়া যাওয়ায় ঘুরিয়া বসিলেন।

রিক্সাওয়ালা প্রশ্ন করিল, "তবে যে বললেন মাঝেরহাট যাবেন, বাবু?"

বলিলাম, "মোড়ে যে বড্ড দেরি হয়ে গেল; গাড়ি পাব না রিক্সায় গেলে।"

তাহাকে গণ্ডা আষ্টেক পয়সা দিয়া আবার একটা ট্রামে উঠিয়া বসিলাম।

ট্রামের মধ্যেকার অবস্থার পূর্বেই নমুনা দিয়াছি, তাহাতে এ আবার অনেকখানিটা পথ, মাঝে একটা বদলি; শেষ পর্যন্ত মেজাজের অবস্থা এত খারাপ হইয়া উঠিল যে, একটি লোকের সঙ্গে একটু বচসা গোছেরই হইয়া গেল। সকলে তাহারই পক্ষ লইল—মাছ কিনিয়া লইয়া যাইতেছি—না হয় ইলিশ মাছই—না হয় পাঁচ টাকা দিয়া মাছ কিনিবার ক্ষমতাই আছে আমার—তাই বলিয়া সামান্য একটা প্রশ্ন—

কিনা কতয় হইল মাছটা—এটুকুর উত্তর একটু ভদ্রভাবে দেওয়া যায় না ?

একজন আবার ভদ্রলোককেই ধিক্কার দিল, "আপনিও যেমন! মানুষ দেখে জিগ্যেস করতে হয়, লড়ায়ের কল্যাণে ভদ্র কাপড়-চোপড় তো সবাই পরছে আজকাল মশাই!"

একজন বৃদ্ধ একটু বক্র হাসিয়া বলিলেন, "সেই জন্যেই চেনা যায় না কিনা, ওঁর আর দোষ কি ?"

স্টেশনের খানিকটা আগেই আমায় নামিয়া পড়িতে হইল।

রেলে যেটুকু আসিলাম, খালি গাড়ি বদলাইতে বদলাইতে আসিলাম; ইণ্টার ক্লাসেই যাওয়া-আসা করি—ইণ্টার ক্লাসেরই টিকিট করিলাম। অতিষ্ঠ করিয়া দিল একেবারে। গাড়ি ছাড়িবার আগেই সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিয়া গেলাম। একটি মাত্র আরোহী, তিনিও একেবারে হ্যাটকোটধারী, দাঁতে একটা ক্লে-পাইপ টিপিয়া একখানা ইংরেজী খবরের কাগজ পড়িতেছেন; মাছটার পানে একটু আড়ে চাহিয়া আবার খবরের কাগজে মনঃসংযোগ করিলেন। গন্ধের জন্য বোধ হয় বিরক্ত হইয়াছেন।—তা সেও ভালো, খুব একটা স্বস্তি অনুভব করিলাম। কাগজের পাশ দিয়া আরও দুই তিনবার বক্র দৃষ্টি হানিলেন।

তা হানুন,—ভারি তো সম্বন্ধ আমার সঙ্গে। গম্ভীর হইয়া মুখটা ঘুরাইয়া বাহিরের পানে চাহিয়া প্রশ্নহীন নীরব মুহূর্তগুলি উপভোগ করিতে লাগিলাম।

"কতয় হ'ল ?—ইলিশ মাছ বলে মনে হচ্ছে যেন ?"

হা অদৃষ্ট! এত ইস্ত্রি-দুরস্ত কোটপ্যাণ্ট, নিখুঁৎ ফেল্টহ্যাট, অতি নিখুঁৎ টাই, এই পাইপ হাতে—এই সাহেবিয়ানার ভেতরেও সেই চিরন্তন মৎস্য-লুব্ধ বাঙালী!

পরের স্টেশনে ফার্স্ট ক্লাস আশ্রয় করিলাম। একেবারে নির্জন।

গাড়ি ছাড়িবার মুখে গার্ড উঠিয়া আসিল—নিজের গাড়ি ছাড়িয়া। রোজ যাতায়াত করি; চেনা মুখ; সহানুভূতির স্বরে প্রশ্ন করিল, "গাড়ি বদলে বেড়াচ্ছেন, মাছটা একটু এলিয়ে গেল নাকি? হ'ল কতয়?"

একলা পাইয়া অজস্র বকাইল। অতিরিক্ত ভাড়া আদায় না করিয়া খানিকটা বাধ্য-বাধকতায় ফেলিয়া অবস্থাটা আরও শোচনীয় করিয়া তুলিল। যখন নামিলাম, রাগে ক্ষোভে বিরক্তিতে কান দুইটা গরম হইয়া উঠিয়াছে।

* * *

দোরের কড়া নাড়ার গুরুত্ব বুঝিয়াই একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল। তা না হইয়া ছেলেটা দোর খুলিয়াই উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "বাঃ, কতয় হ'ল, বাবা? বুঝি..."

লেক মার্কেট থেকে এ পর্যন্ত যত রাগ যত বিরক্তি সঞ্চিত হইয়াছে একটি চড়ে নিঃশেষ করিয়া বলিলাম, "হতভাগা! আগে বাড়ি ঢুকতে দে ভালো করে, তা নয়..."

উঠানে ছিটকাইয়া পড়িয়া ছেলেটা ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিতে গৃহিণী ছুটিয়া আসিলেন। তাহার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া চোখে মুখে যতটা সম্ভব ধিক্কারের ভাব আনিয়া বলিলেন, "বাড়ি ঢুকেই ছেলেটাকে ঐরকম করে মারলে, তুমি কী গো! বাছা ককিয়ে যে মারা যাবার..."

তাহার পরেই হাতের মাছটার উপর নজর পড়িল; স্বামীর নৃশংসতা, ছেলের বাড়ি-ফাটানো কান্না সব ভুলিয়া গিয়া একটি লুব্ধ

প্রশংসার হাসি মুখে করিয়া আগাইয়া আসিলেন। মাছটা হাত হইতে লইয়া একটু তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "ওমা, কী চমৎকার মাছটি!—ইলিশ যে গো!—ডিমে ভরা!...কতয় হ'ল গা?"

[আনন্দবাজার পত্রিকা, দোল সংখ্যা ১৩৫২]

শ্রীচরণ

ফুটবল ম্যাচ খেলিতে চলিয়াছি। একজন এক্স্ট্রা অর্থাৎ ফালতু লইয়া বারোজন প্লেয়ার, একটা চাকর আর দুইজন শিক্ষক, আমাদের গেম্-টীচার সেকেণ্ড মাস্টার মহাশয় আর হেড্ পণ্ডিত বজরং চৌধুরি। পণ্ডিতজী চলিয়াছেন আমাদের যাত্রার কোথাও কোন বিঘ্ন না হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্য।

আমরা হেড্ মাস্টার মহাশয়কে বলিলাম, "আরও কয়েকজন ছেলেকে যেতে দিন স্যার, কম্‌পিটিশান ম্যাচ্ কিনা।"

অনেক পূর্বের কথা হইতেছে, সে সময় কম্‌পিটিশান ম্যাচের মানেই ছিল মাথাফাটাফাটি। আমাদের ক্যাপ্‌টেন দংগী সিং মাঠে নামিবার পূর্বে সবাইকে স্মরণ করাইয়া দিত, "দেখো ভাই, এক রোজ মর্‌ণাহি হ্যায়।" কম্‌পিটিশান ম্যাচ মাত্রই সে হল্‌দিঘাটের যুদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইত। সে যুগে এ-প্রান্তে একটি মাত্র শীল্ড ছিল, চূর্ণ হাড়ের স্তূপ আর তপ্ত রক্ত স্রোতের মধ্যে দিয়া তাহার সমীপে পৌছিতে হইত।... এ-যুগেও খেলা হইতেছে! নামটাও 'ফুটবল'ই রহিয়াছে!

বহুদিন—প্রায় বছর পনর ষোল পরে—সেদিন দংগী সিং-এর সহিত দেখা। ফুটবল ছাড়িয়া দিয়াছে, হাসিয়া পিঠে একটা চাপড় কষিয়া বলিল, "আজকাল তো লেডী সব ভি ফুটবল খেলতি হ্যায়, ভাই!"

হেড মাস্টারকে বলিলাম, "ফ্রেণ্ডলী হ'লে চলে যেত স্যার, এটা কম্‌পিটিশান কিনা..."

হেড মাস্টার বলিলেন, "কম্‌পিটিশান মানে তোমরা কি বুঝেছ খুলে বলো দিকিন?...খবরদার—সে রকম নালিস যেন না শুনি।"

সেকেণ্ড মাস্টার বলিলেন, "তোমরা হ'লেও তো প্রায় কুড়ি বাইশ জন বাপু, আর দুঃখু কিসের ?"

হেড মাস্টার মহাশয় হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কপিলদেওকেই গোলে দেওয়া ঠিক করলেন নাকি ?"

একা কপিলদেওকে পাঁচ-ছয়জনের সামিল ধরিয়া লওয়ার একটা রেওয়াজ আছে স্কুলে।

সেকেণ্ড মাস্টার বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের হিমাংশুবাবু যতক্ষণে ক্যালকেশিয়ান্ স্টাইল দেখাবেন, ও ততক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু হাতটা বাড়িয়েই বল্ রুখে নেবে। আর সঙ্গে ওরকম একটা অসুর থাকাও ভাল—বিদেশ বিভুঁই...হিমাংশুকে অবশ্য নিয়ে যাচ্ছি একস্ট্রা করে।"

হেড মাস্টার বলিলেন, "না, বিলাসবাবু, বড কড়া ইন্‌সপেক্টার—জানেনই। কোথায় কপিলদেও ?—আমি তাকে মানা করে দিচ্ছি..."

কপিলদেও ছিল না। প্লেয়ার হইয়া প্রথম বাহিরে যাইতেছে। কাল সমস্ত দিন বাজার ঘুরিয়া অতিকষ্টে একজোড়া নাগরা জুতা জোগাড় করিয়াছে, তাহাকে সযত্নে রেড়ির তেল খাওয়াইতেছে। স্কুলের ছেলে মহলে একটা কৌতুক-চঞ্চলতা পড়িয়া গেছে, নানা ছুতানাতা করিয়া সবাই কপিলদেওয়ের জুতা দেখিয়া আসিতেছে।

কপিলদেওকে বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিব না, কেন না এ সৌখীন যুগের হালকা ফিন্‌ফিনে ভাষায় কপিলদেওয়ের চেহারার মর্যাদা রাখা যায় না। কপিলকে দেখিয়া আমার কেমন যেন মনে হইত—আগামী সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের জন্য বিশ্বকর্মা যে সব অতিকায়দের সৃষ্টি করিতেছেন, তাহাদেরই মধ্যে হইতে একজন যেন পথ ভুলিয়া এ-যুগে নামিয়া পড়িয়াছে—আগামী যুগের ভীম, ঘটোৎকচ, অশ্বত্থামা—এই

রকম একজন কেউ, ঠিক ঐ জিনিস, তবে এ যুগের জল-হাওয়ার দোষে পরিমাণটা ঠিক ওদের মতো হইতে পারে নাই। বিরাট শরীর, সদাপ্রসন্ন আত্মভোলা ভাব, প্রাণান্তে চটে না, কিন্তু কখন যদি চটিল তো প্রাণান্ত না করিয়া নিরস্ত হয় না। পড়ার সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, প্রমোশন বিষয়ে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। তিন চার বছর অন্তর চক্ষুলজ্জার খাতিরে তাহাকে এক একবার উচ্চতর ক্লাসে তুলিয়া দেওয়া হইত। এই করিয়া এখন সে থার্ড ক্লাসে। কোন সময় স্কুল থাকিবে, অথচ কপিলদেও থাকিবে না—এ কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারে না।

গাড়ি হইতে সদলবলে স্টেশনে নামিয়া প্ল্যাটফর্মের বাহিরে আসিতেই ঝাঁকে ঝাঁকে হোটেলওয়ালা আমাদের ঘিরিয়া ফেলিল, টানাটানি লাগাইয়া দিল—"সাত তরকারি চাটনি······চার তরকারি চাটনি······তিন তরকারি মাংস, দহি, চাটনি······আইয়ে বাঙ্গালীবাবু ······এদিকে আসেন বাঙ্গালীবাবু—ঘোরের রান্না খান, আমি দিনাজপুরে থাকিয়ে ছিলাম—দিনাজপুরের আমিরী ঝার হোটেল···"

আমরা বলিলাম, "ওসব দিনাজপুর-ফিনাজপুর কাজ নেই স্যার, একটু মাংস পেটে পড়া দরকার—কম্‌পিটিশান ম্যাচ্‌ কিনা।"

সবাই জোর করিল, মাংসের হোটেল আশ্রয় করাই স্থির হইল। হোটেলওয়ালার নাম দুখ্‌হরণ মিশির। একটা ঘরে আমাদের জায়গা দিল, চাকরটা গোটাদুয়েক সতরঞ্চি আনিয়া দিল, হোটেলওয়ালাও দুইটা দিল, আমরা গুছাইয়া সুছাইয়া বসিলাম। ঘরটাতে এক দরজা ভিন্ন আর আলোর পথ না থাকিলেও, বেশ প্রশস্ত।

সেকেণ্ড মাস্টার একটু ঘুরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তোমরা সবাই ঠিক আছ তো?···কপিলদেও কোথাও?"

"তাইতো!"—বলিয়া সামনে চাহিতেই দেখি খানিকটা দূরে বাঁ কাঁকালে একটা বেশ ওজনদুরস্ত কাঁঠাল লইয়া নূতন নাগরা জুতার উপর অল্প অল্প খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে কপিলদেও চলিয়া আসিতেছে। আমাদের চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া দূর হইতেই হাসিয়া ফেলিল, তাহার পর ভিতরে আসিয়া কাঁঠালটা সতরঞ্চির এক পাশে রাখিয়া বলিল, "ইহাঁকা কট্‌হর বড়া সস্তা হয়।"

সেকেণ্ড মাস্টার বলিলেন, "মন্দ বুদ্ধি করে নি, তোমরা দু'চারটে করে কোয়া খেয়ে নাও না ততক্ষণ।"

হিমাংশু বলিল "ও দেবার পাত্র নাকি স্থার?"

কপিলদেও হাসিয়া কাঁঠালটা পাশে টানিয়া লইয়া বলিল, "খেল্‌নেকা বাদ্‌ বড়া ভুখ লগ্‌তা হ্যায়, স্থার। হাম অকেলা খা লেঙ্গে।"—তাহার পর আবার হুকুম, অনুরোধ, উপরোধে না পড়িতে হয় সেজন্য ঘরের অপর প্রান্তে একটা অন্ধকার কোণে গিয়া, কাঁঠালটার উপর গায়ের জামাটা জড়াইয়া বালিস করিয়া শুইয়া পড়িল।

এমন সময় হোটেলওয়ালা ওদিককার বন্দোবস্ত তদারক করিয়া একবার খোঁজ লইতে আসিল। আমাদের কোন কষ্ট হইতেছে কি না খোঁজ লইতে গিয়া দুই একটা কথা বিনয়ের হাস্যের সহিত বলিতেই দরজার বাইরে কপিলদেওয়ের নাগরার উপর নজর পড়িয়া একেবারে যেন প্রস্তরবৎ নিশ্চল হইয়া গেল। খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, "এ জুতো কি আপনাদের দলের মধ্যে কারুর?"

দংগী ক্যাপটেনের গর্বের সহিত বলিল, "হামারা গোলকীপার্‌কা হ্যায়।" সঙ্গে সঙ্গে, আমরা ইসারা করিয়া থামাইবার আগেই, ডাক দিল, "কপিলদেও!"

ঘরের ও-কোণটায় একটা ঢেঁকি যেন আধদাঁড়া হইয়া উঠিল। খসখসে আওয়াজে উত্তর হইল, "ক্যা, ক্যাপ্টেন সাহেব!" লোকটা ভীত বিস্ময়ে মূর্তিটির পানে চাহিয়া রহিল একটু, তাহার পর মুখটি অন্ধকার করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে পণ্ডিতজী পা টিপিয়া টিপিয়া একটু ভিতর দিকে গেলেন। একটু পরে যখন ফিরিলেন মুখটি অন্ধকার। ধীরে ধীরে পাঁচছয়বার ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়িয়া নিরাশভাবে বসিয়া পড়িলেন।

সকলে প্রশ্ন করিলাম, "কেয়া বাৎ হ্যায়, পণ্ডিতজী?" বোঝা গেল ভিতরে হঠাৎ কি একটা ব্যাপার লইয়া চাপা গলায় তীব্র আলোচনা চলিতেছে। রহস্যটা লইয়া আমাদের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠিয়াছে, এমন সময় হোটেলওয়ালা আসিয়া হাতজোড় করিয়া জানাইল— লোক পাঠাইয়াছিল, কিন্তু বাজারে পাঁঠাই পাওয়া গেল না।

ব্যাপারটা প্রায় সকলেই বুঝিলাম—কপিলদেও ভড়কাইয়া দিয়াছে। দংগী মারমুখো হইয়া হোটেলওয়ালার সহিত ঝগড়া করিতে যাইতেছিল, সেকেণ্ড মাস্টার তাহাকে থামাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "বেশ, মাছ দিতে পারবে?"

হোটেলওয়ালা উৎসাহের সহিত জানাইল যদি মাছ খাইবার বাসনা থাকে তো দুইটা দোকান ছাড়াইয়া পাশের হোটেলে খাওয়াই ভালো—অমন মাছের রান্না এ-তল্লাটে কেহ করিতে পারে না।

সেকেণ্ড মাস্টারের হুকুমে ক্যাপ্টেন এবং আমরা কয়েকজন খোঁজ লইতে উঠিলাম। কপিলদেও-ও উঠিতে যাইতেছিল—পণ্ডিত মহাশয় মানা করিলেন। সেকেণ্ড-মাস্টার মহাশয় বলিলেন, "না, কপিলদেও যাক্—সব খোলাখুলিই ভালো।"

খবরটা চারাইয়া গিয়াছিল। সে হোটেলওয়ালা একবার আড়চোখে কপিলদেওয়ের পানে চাহিয়া লইয়া বিনীতভাবে বলিল, "না বাবু, আমরা মছরি রান্ধে না, এটা বৈষ্ণবের হোটেল।"

'কপিলদেও!'

আমি বলিলাম তবে যে ওরা বলিল খুব ভালো মাছ রাঁধা হয় এখানে ?"

হোটেলওয়ালা একেবারে ভীষণ খাপ্পা হইয়া উঠিল, "কৌন্ শালা কহা হ্যায় বাবু, জো হামসব আচ্ছা মছরি রান্‌হ্ তেঁ-হেঁ, চলিয়ে তো!" অর্থাৎ, চলুনতো দেখি কোন শালা বলেছে আমরা ভালো মাছ রাঁধি।

প্রশংসার এমন প্রতিদান পূর্বে কখনও দেখি নাই, আমরা তো একেবারে থ হইয়া গেলাম! হোটেলওয়ালা খড়ম পায়ে প্রায় লাফাইয়াই বারান্দা হইতে নামিয়া চিৎকার করিতে করিতে প্রথম হোটেলের পানে হন্ হন্ করিয়া অগ্রসর হইল, আমরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে করিতে পিছু লইলাম। তাহার পর সে কি ঝগড়া!—

"কে বলেছে আমার হোটেলে মাছ ভালো রান্না হয়? বড় যে কাড়াকাড়ি করে খদ্দের কেড়ে নিয়েছিলি—এখন খাওয়া মাংস!"

"আমি বলেছি—আলবৎ বলেছি—তোর মেছো হোটেল, বলব না?"

"তোর কসাইয়ের হোটেল—খাওয়া মাংস কত খাওয়াবি···খাসি জবাই করে পয়সার দেমাক হয়েছে? তোকে কপনি পরিয়ে যদি রাস্তায় না দাঁড় করায় ঐ বাবু তো আমার নামে কুকুর পুষিস······ওকে ভগবান পাঠিয়েছেন তোর দর্প চূর্ণ করবার জন্যে।···তুমি হরদম চালিয়ে যাও বাবু,—কানুন আছে, ও ব্যাটা একজনের বেশি চার্জ করতে পারবে না···পাঁঠা খাওয়াবে বলে বসিয়ে পালাবে কোথায় ও শালা। ওকে হবে খাওয়াতে, এই আমি খাসি কিনে আনছি··· আপনারা কাটিয়ে রাঁধিয়ে খেয়ে তবে যাবেন···খাসির দামটা কেটে সুধু আমায় দেবেন—আমি এক্ষুণি লোক পাঠাচ্ছি...সৌখীন, হাল্কা-খাইয়েদের ছটাক খানেক করে মাংস খাইয়ে উনি টাকার আণ্ডিল করুন—আর যত সব রাঘব বোয়াল আমাদের ভাগ্যে,—খদ্দের লিলিয়ে দেওয়া!······"

হুংকারে সমস্ত বাজারটা কাঁপাইয়া সেইরকম খড়মের আওয়াজ করিতে করিতে ফিরিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে আমরা দুখ্‌হরণকে বলিলাম, "খাসি যখন যোগাড় হচ্ছে তখন তো তোমাদের কোন আপত্তি থাকতে পারে না।"

দুখ্‌হরণের মুখটা শুকাইয়া আমসিপানা হইয়া গিয়াছিল, উৎসাহের ভাব দেখাইয়া বলিল, "এনে দিক না ও শালা, বাবু, আমাদের খাওয়াতে আপত্তি কি? পয়সার জন্যেই তো হোটেল করা।...আচ্ছা আপনারা ততক্ষণ আরাম করুন, আমরা যোগাড়যন্ত্র করিগে।"—বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

শুইয়া গড়াইয়া আমাদের প্রায় আধঘণ্টা তিন কোয়ার্টার কাটিয়া গিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ ছাগলের ডাক কানে গেল। কয়েকজন উৎসুকভাবে বাহিরে আসিয়া দেখি মাছের হোটেলওয়ালা তিনটে দড়িতে তিনটে মাঝারি সাইজের ছাগল হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনিতেছে। সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "সহর বাজার, খাসি পাওয়া যাবে না! আরও খান তো আরও এনে দোব।"

তারপর কপিলদেওয়ের কাছে আসিয়া তাহার পিঠ ঠুকিয়া বলিল, "একটি খাসি—এই রাঙাটা তোমার খাস রইল। শেষ করা চাই চৌধুরীজী...বাঃ, চৌধুরী আমাদের কত বাহাদুর!...একটি পয়সা বেশি চার্জ করতে পারবে না ও-বেটা! ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আরদালি জংগল পাঁড়েকে একদিন ডবলচার্জ করার পর থেকে এই নিয়ম হয়েছে। ...ডাকুন না, এসে নিয়ে যাক্‌ খাসি...দাম আড়াই টাকা—ওর সঙ্গে ডাল, ভাত, তিনটে তরকারি খেয়ে তিনটি আনা পয়সা দিয়ে দেবেন—একটি পয়সা বেশি নয়।"

'আরও খান তো আরও এনে দেব'

কপিলদেও সতৃষ্ণ নয়নে পাঁঠাটার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "অর্ধেকটার বেশি কি পারব ?"

"খুব পারবেন; কতই বা হবে?—পাঁচ সের?—খুব জোর ছ'সের?"—বলিয়া নিজেই ডাক দিল, "মিসিরজি! খস্‌সি লে যাইয়ে।"

কোন উত্তর হইল না। দ্বিতীয়বার ডাকেও উত্তর নাই।

"ডেকে আনছি"—বলিয়া আমি আর দংগী ভিতরের দিকে পা বাড়াইলাম।

আমাদের ঘরটার পাশেই আধাবারান্দা গোছের আর একটা ঘর, তাহার পরে ছোট একটা বারান্দা; বারান্দার এক কোণ দিয়া ভিতরে যাইবার দরজা। এদিক থেকে দেখা যায় না।

দুইজনে গিয়া দেখি দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। ডাকিতে সাড়া নাই; ধাক্কা দিতে সাড়া নাই, শেষে চেঁচামেচি করিতেও সাড়া নাই। চেঁচামেচিতে অন্য সব ছেলে আসিয়া জুটিল, শেষে সেকেণ্ড মাস্টার, পণ্ডিতজী, এমন কি তিনটে খাসিসুদ্ধ হোটেলওয়ালা পর্যন্ত।... কা কস্য পরিবেদনা!

"রহিয়ে, দেখেঁ"—বলিয়া কপিলদেওয়ের হাতে খাসির দড়ি তিন গাছা দিয়া হোটেলওয়ালা বাহির হইয়া গেল। মিনিট খানেকের মধ্যে ঘুরিয়া আসিয়া নিরাশা এবং পরাজয়ের একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, "ভাগ গিয়া বাবু, উধর তালাভর দিয়া; বড়া ছকায়া"—অর্থাৎ খিড়কির দোরে তালা এঁটে পালিয়েছে, বড়ই ঠকালে।

কপিলদেও-ও লাল ছাগলটার পানে একবার চাহিয়া ফোঁস করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, তাহার পরে আস্তে আস্তে দড়ি তিনটা তাহার হাতে তুলিয়া দিল

বেলা তখন প্রায় নয়টা। সেকেণ্ড মাস্টার চিন্তিতভাবে সবার

দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "উপায় এখন তাহ'লে?" বোধ হয় অবাধ্যভাবেই নজরটা একবার মূর্তিমান সমস্যা কপিলদেওয়ের উপর গিয়া পড়িল। হোটেলওয়ালা আক্রোশ মিটাইয়া ছাগল তিনটাকে ঠেঙাইতে ঠেঙাইতে হাঁকাইয়া লইয়া যাইতেছিল, দংগী ডাকিল, "এ সাহেব!"

হোটেলওয়ালা ঘুরিয়া দাঁড়াইতে বলিল, "আপ্‌হি খিলা দিজিয়ে না।" অর্থাৎ, তুমিই খাইয়ে দাওনা আমাদের।

হোটেলওয়ালা একবার কপিলদেওকে দেখিয়া লইয়া—উগ্রধরণের কি একটা বলিতে যাইতেছিল, সামলাইয়া লইয়া বলিল, "না বাবু, আমায় এক্ষুনি এক কোশ পথ ছুটতে হবে শালা অপয়া খাসিগুলোকে ফিরুতে।"—বলিয়া কপিলদেওয়ের জন্য বাছিয়া আনা রাঙা ছাগলটার পেছনে এক লাথি কষিয়া দিল।

আমাদের অগত্যা পাত্তাড়ি গুটাইয়া রাস্তায় নামিতে হইল। হোটেলের সতরঞ্চি দুইটা সবার লইয়া যাওয়াই মত ছিল, সেকেণ্ড মাস্টার মহাশয়ের জন্য হইল না। তিনি পাশের দোকানে জমা দিয়া একটা রসিদ লইলেন।

সাবডিভিশান টাউন, ততক্ষণে মুখে মুখে খবরটা বেশ চারাইয়া পড়িয়া বেশ একটি ছোটখাট গোছের ভিড় আমাদের সঙ্গী হইয়াছে,—স্কুলের ছেলে, আদালত-হাঁটা নিষ্কর্মার দল, স্টেশনের মোসাফির, গোটাকতক কৌতূহলী কুকুর এবং লোক সমাগমের সুযোগ দেখিয়া গোটা দু'এক ভিখারী। আমরা যে হোটেলেই যাইতেছি কোন না কোন ছুতা করিয়া বিদায় করিয়া দিতেছে। ভিড়টা চাপ বাঁধিয়াছে কপিলদেওয়ের চারিদিকে, কয়েকজন ভাব করিয়া লইয়া বিস্মিতনেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নানারকম প্রশ্ন করিতেছে—কোথায় ঘর—

ঘরে রোজ কত খায়—নিমন্ত্রণে কতদূর পর্যন্ত আহার করিতে পারে—জুতা জোড়াটা কততে হইল—ফরমাসী, না তৈয়ারী পাওয়া গেল... একবার ডান পাটা বাহির করিবে কি ?...বাস্‌রে, ঐ বুড়া আঙ্গুল !—ওটাই তো একটা পা !

ছয় সাতটা হোটেল ঘুরিয়া শেষে একটা হোটেল রাজি হইল। কিন্তু এই সর্তে যে কপিলদেও তখনই কাঁঠালটা খাইয়া লইবে, তাহার পর ভাত, ডাল, তরকারি রন্ধন হইলে সকলের সঙ্গে আহার করিবে। কাঁঠালটা কপিলদেও খেলার পরের ক্ষুধার জন্য জোগাইয়া রাখিয়াছিল, অনেক কষ্টে সকলের উপবাসের সম্ভাবনা দেখাইয়া তাহাকে রাজি করা হইল। পণ্ডিতজী বলিলেন, "তোর জন্যে কাঁঠাল আমরা একটা আনিয়ে রাখচি ; দেখচিস্‌, রোদ্দুরে খিদেয় ছেলেগুলো যেন নেতিয়ে পড়েচে ; বেলাও তো কম হ'ল না ; সাড়ে দশটা প্রায় বাজে।"

আমরা সব মনে মনে উত্যক্তও হইয়া পড়িয়াছিলাম, শুধু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিতেছিলাম না। হিমাংশু নূতন বাংলাদেশ হইতে আসিয়াছে, যুক্তিতর্কের একটু বেশি পক্ষপাতি ; বলিল, "আর ওর জন্যেই আমাদের তো এই দশা, এটুকু স্যাক্রিফাইস্‌ করতে পারবে না ?"

কপিলদেওয়ের কাঁঠাল খাওয়া দেখিবার জন্য হোটেলের সামনে ভিড় আরও জমিয়া উঠিয়াছে। হোটেলওয়ালা রাস্তায় নামিয়া সব ঠেলিয়া ঠুলিয়া সরাইয়া দিল। তাহার পর ভিতরে গিয়া তাড়াতাড়ি রন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া পণ্ডিতজীর সঙ্গে সুখ-দুঃখের গল্প জুড়িয়া দিল। সকলে বুঝিলাম কাঁঠালের কোয়া যাহাতে একটাও এদিক ওদিক না যাইতে পারে সেই দিকে নজর রাখিবার জন্যই এই ফিকির।

সেকেণ্ডমাস্টারের বোধ হয় এই ধরণের একটা ধারণা ছিল যে সব ছেলেরাই একটা করিয়া কোয়া লুকাইয়া চুরাইয়া খাইয়া লইবে, ইহাদের জঠরাগ্নিও কতকটা তৃপ্ত হইবে, কপিলদেওয়ের জঠরেও ভাতের জন্য একটু জায়গা থাকিবে। সে পথ বন্ধ হইল দেখিয়া দংগীকে বলিলেন, "তোরাও না হয়, কিছু জলখাবার আনিয়ে নে না, বেলা হয়ে গেছে তো।"

হোটেলওয়ালার মতলববাজিতে রাগে ছেলেদের মুখ থমথমে হইয়াছিল; সেকেণ্ড মাস্টার মহাশয়ের কথায় সকলের মধ্যে একটা গূঢ় দৃষ্টিবিনিময় হইয়া গেল। দংগী বুকটা একটু চিতাইয়া বলিল, "নেহি মাস্টার সাহেব, হামলোক ভুখে হি রহেংগে।"—অর্থাৎ, না, ক্ষিদে নিয়েই থাকব।

হোটেলওয়ালা আলাপের মধ্যে একবার শঙ্কিত নেত্রে তাহার পানে চাহিল। মিনিটখানেক পরে কি ভাবিয়া আবার ভিতরে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে অর্থাৎ বারোটা পর্যন্ত আহার্য প্রস্তুত হইল।

আহারার্থীদের অবস্থা—ঔদরিক এবং মানসিক—যা দেখান হইয়াছে তাহার পর আহারের বর্ণনা দিবার প্রয়োজন দেখি না। কপিলদেওয়ের সম্বন্ধে একটা সন্দেহ থাকিতে পারে, ঘণ্টা দেড়েক আগেই গোটা একটা কাঁঠাল খাইল।...সে তাহার মামুলী আহার করিল, কি আক্রোশের বশে বেশি আহার করিল বলিতে পারি না। তবে হোটেলওয়ালা শেষ পর্যন্ত আর জোগান দিতে পারিল না। ভাঁড়ার থেকে চালের থলে, ডালের টিন আর তরকারির ঝুড়ি বাহিরে আনিয়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া গলায় গামছা লাগাইয়া করজোড়ে সেকেণ্ড-মাস্টারকে বলিল, "হুজুর, এখন যা হুকুম করেন। আমি তো ডুবলাম।"

পাঁচটা তিন মিনিটে আমরা সাজগোজ করিয়া হোটেল হইতে বাহির হইলাম। পণ্ডিতজী পঞ্জিকা দেখিয়া ঠিক করিয়াছেন ঠিক তিন মিনিটে যাত্রা, তাও আবার যেদিকে যাইব সেদিকে যাত্রা নাস্তি, আমরা নামিয়া পনের বিশ পা উল্টাদিকে গিয়া আবার ফিরিলাম।

'হুজুর, আমি তো ডুবলাম'

কপিলদেও খেলিতে পারিল না। কোরা নাগরা পায়ে হোটেল ঘুরিয়া ঘুরিয়া উহার পায়ের অবস্থা এমন হইয়াছে যে শুধু পায়েই উহাকে খোঁড়াইতে হইতেছে।

গোলকীপার হইল হিমাংশু।

পণ্ডিতজীর নির্দেশ অনুষায়ী আমরা উত্তর-পূর্ব কোণ দিয়া খেলার মাঠে প্রবেশ করিলাম। পণ্ডিতজী একটা কি শ্লোকও বলিলেন—তাহার মানে—ঝড় এবং যুদ্ধ ঈশান কোণ হইতেই প্রশস্ত। খানিকটা ভিতরে গিয়া দংগী সবাইকে জড়ো করিয়া উদাস গাম্ভীর্যের সহিত প্রশ্ন করিল, "বাহাদুর সব—জিন্দ্‌গিমে কয় দফে মরতা হ্যায় আদমি?"—অর্থাৎ বীরগণ, জীবনে মানুষ কয়বার মরে?

সেকেণ্ডমাস্টার ফীল্ডেই ছিলেন, সশংকিত হইয়া কতকটা বুঝাইয়া, কতকটা রাগিয়া বলিলেন, "না দংগী, খবরদার ও স্পিরিট নিয়ে খেলো না, বিদেশ, তোমরা মোটে জন পনের লোক…"

দংগী বলিল, "তাতে কি হয়েছে স্যার? পাণ্ডবরা ক'জন ছিলেন? আর ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে মারা সে তো কুকুরের ধর্ম। কিরকম ব্যবহার এখানকার লোকেরা আমাদের সঙ্গে করলে দেখলেন তো? আমাদের খেতে না দেওয়ার মতলব করেছিল। আপনি জানবেন স্যার, এর পেছনে এখানকার স্কুলের কারসাজি আছে। দেখলেন না? পয়সা নিয়ে আমাদের আধপেটা খাওয়ালে? আর একটা কথা টের পেলাম, স্যার।"

"কি?"

"যে হোটেলওয়ালা আমাদের অমন করে ছেড়ে পালাল তার ছেলে ওদের ক্যাপটেন।"

সেকেণ্ড মাস্টার কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় রেফারী হুইসিল দিল। কপিলদেও, পণ্ডিতজী, আর চাকরটাকে সঙ্গে লইয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

দংগী নায়কের মতোই আর একবার শেষবারের মতো সবাইকে

উত্তেজিত করিল—প্রশ্ন করিল, "শেষ পর্যন্ত আমাদের একজন ভালো প্লেয়ারকে যে বসতে হল খোঁড়া হ'য়ে, তার জন্য দায়ী কে ?"

দায়ী অবশ্য একজোড়া বলদ যাহারা জুতার আকারে কপিলদেওয়ের শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়াছে ; কিন্তু সে উত্তর চাওয়াও হয় নাই, কেহ দিলও না, সকলে বলিল, "শত্রুপক্ষ।"

"যাও, সেই কথা মনে করে খেলো। আবার যদি দেখাই হয়, সে জেনো স্বর্গে।"

আমরা গিয়া নিজের নিজের স্থান অধিকার করিলাম।

সে যুগে এসব অঞ্চলে কম্‌পিটিশান ম্যাচের খেলা প্রায়ই শেষ হইত না। মিনিট পনের ষোল খেলা হইয়াছে কি না হইয়াছে, যথারীতি মারামারি আরম্ভ হইয়া গেল। কি করিয়া এবং প্রথম কোন্ পক্ষের দ্বারা আরম্ভ হইল বলা যায় না, তবে একেবারেই পুরোমাত্রায় আরম্ভ হইয়া গেল! প্রথমে ফীল্ডের মধ্যে, তাহার পর ফীল্ডের বাহিরে, প্রথমে বাইশজন, তাহার পর যে কতজন তাহার হিসাব করা যায় না। আর, একদিকে পাণ্ডবের কয়টি লোকই যে রহিলাম তাহা নয়, কি জানি কেমন করিয়া আমাদের হইয়াও অনেক লোক লড়িতেছে। আজকাল হিসাব করিয়া স্বার্থ খতাইয়া লড়ে। সেযুগে শুধু লড়াইয়ের আনন্দেই লড়িত, একদিকে পনের আর অন্যদিকে দু'শ লোকের লড়াই টিকে না বলিয়াই কেমন যেন অজ্ঞাতসারেই ভাগাভাগি হইয়া যাইত।

স্টেশনে যখন আমরা একত্রিত হইলাম তখন পরস্পরকে চেনা দায়। দংগীর মাথার টিকিই প্রায় লুপ্ত, গোণাগুনতি কয়েকটা চুল রক্তের সংগে লাগিয়া আছে। ওদিকে কপিলদেওয়ের হাত একগোছা টিকি, ছোটবড় বাছিয়া বাছিয়া হিসাব দিল নয়টি মস্তক নিঃশিখ করিয়াছে। কিন্তু জুতাজোড়াটি আর সঙ্গে আনিতে পারে নাই।

সে-যুগে ফুটবল কম্‌পিটিশানের শেষ অঙ্কের অভিনেতা ছিলেন—ইন্‌স্‌পেক্টর অফ স্কুল্‌স্‌।

প্রায় মাসখানেক পরে—কোন বিজ্ঞপ্তি আদি না দিয়াই একদিন ইন্‌স্‌পেক্টর আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে ও-পক্ষের দুইজন শিক্ষক ও কয়েকজন ছাত্র, একজনের চোখের উপর তখনও পটি বাঁধা।

আমরা সাবধানে ছিলাম, একদিন না একদিন আসিবেনই—জানা কথা। কাগজপত্র ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেকেণ্ডমাস্টার এসব বিষয়ে খুব পোক্ত ছিলেন। আমাদের তরফ থেকে বাছিয়া বাছিয়া অপেক্ষাকৃত দুর্বল, এবং কোনখানে টাটকা ঘায়ের দাগ আছে এইরকম ছেলেকে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল; সবাইকেই তালিম দেওয়া ছিল। ঐ ধরণের কয়েকজন প্রকৃত ম্যাচ-প্লেয়ারও ছিল। বাকি আসল প্লেয়ারদের প্রতিদিনই হাজরির বিশেষ একরকম ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহারা আপনিই কখন খসিয়া পড়িল। সুধু দংগী সিং যেমনকে তেমনই রহিল। বলিল, "আমি শিশোদিয়া রাজপুত স্যার, আমায় তাহ'লে বাড়ি ঢুকতে দেবেনা, মা।"

সেকেণ্ডমাস্টার ইন্‌স্‌পেক্টারকে বলিলেন, "এই আমাদের প্লেয়ার, স্যার। এখন, এই তালপাতার সেপাইরা অতগুলো ছেলেকে তাদের নিজের ঘরে গিয়ে ঘায়েল করে এসেছে বলে কি বিশ্বাস করেন? হয়তো তারা আত্মরক্ষার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তারা একটা গোটা সহরের বিরুদ্ধে লড়ে জিতে এলো যদি মনে করেন তো যা সাজা দেবেন আমরা মাথা পেতে নিতে রাজি আছি।"

ইন্‌স্‌পেক্টার ছিলেন সাহেব, বলিলেন, "I would reward them if they could do it". (যদি পারত তা করতে, তো ওদের বকশিষ দিতাম আমি)

সেকেণ্ডমাস্টার সাহেবের কথায় উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "বলেন তো স্কুলের সব ছেলেকেই সামনে সারবন্দি করে দাঁড় করিয়ে দিই, স্যার।"

"I don't think that is necessary" (দরকার দেখি না)—বলিয়া ইন্‌স্‌পেক্টার উহাদের ছেলেদের প্রশ্ন করিলেন, "কি, এরাই সব ছিল তো?"

অত মুখ চিনিয়া রাখা মুস্কিল, তায় ভিন্ জায়গা, তাহার উপর চোখে ধূলা দিবার জন্য ছিলও অনেকগুলি চেনা মুখ ঐ সঙ্গে। ছেলেরা থতমত খাইয়া গেল। একজন বলিয়াও ফেলিল, "Yes, sir"

ইন্‌স্‌পেক্টার উহাদের শিক্ষকদের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "You see Babu, these boys could not have performed the miracle you credit them with." (যা ভোজবাজি দেখিয়েছে বলে এদের যশ দিচ্ছ আসলে তা এদের পক্ষে সম্ভব নয়।)

আমাদের হেডমাস্টার নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে আর সাক্ষাৎ মিথ্যা কথা বলিবেন না বলিয়া চুপ করিয়াছিলেন, ফাঁড়াটা কাটিয়া গেল দেখিয়া তিনিও নিশ্চিন্তমনে হাসিতে যোগ দিলেন।

এমন সময় প্রায় আধ হাত চওড়া আর পৌনে এক হাত লম্বা একটা কাগজের মোড়ক লইয়া একটি লোক প্রবেশ করিয়া সেলাম করিল। তাহার দিকে চাহিয়া আমাদের সকলেরই মুখ শুকাইয়া গেল।

সাহেবকে আর একটা আভূমি সেলাম ঠুকিয়া লোকটা বলিল, "শুধু এরাই লড়ে নি হুজুর, আরও একজন ছিল, সে একাই পঞ্চাশ-জনের মোহড়া নিতে পারে।"

আমরা সবাই পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলাম। ফীল্ডে

নামে নাই বলিয়া কপিলদেওয়ের কথা কেউ বড় একটা ভাবি নাই, তাহার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই। না করিবার আরও একটু কারণ ছিল। আমের ফসল ভালো হইয়াছে বলিয়া কপিলদেও এদিকে দিন কুড়ি বাড়ি গিয়া বসিয়াছিল, সবে দিন চারেক হইতে আসিতেছে, কেহ আর অতটা খেয়াল করে নাই, বিশেষ করিয়া ব্যাপারটাও এদিকে পুরানো হইয়া আসিয়াছে।···আমাদের মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল।

ইন্‌স্‌পেক্‌টার হেডমাস্টারের দিকে চাহিলেন, হেডমাস্টার সেকেণ্ড-মাস্টারের দিকে প্রশ্ন করিলেন, "আর কেউ খেলেছিল নাকি, বিলাস বাবু ?

সেকেণ্ডমাস্টার একটা ইতি-গজ জাতীয় সত্য কথায় কাটাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, বলিলেন, "অন্য কেউ তো আর খেলে নি।"

লোকটা বলিল, "হুজুর, আমার সঙ্গে যদি একবার ঘোরেন দয়া করে তো আমি চিনিয়ে দোব, না পারি যা সাজা দেন। অবশ্য যদি সে ছেলে এসে থাকে।"

সকলে আমরা ক্লাসে ক্লাসে ঘুরিতে উঠিলাম। ফার্স্ট-ক্লাস দেখিয়া, সেকেণ্ড ক্লাস দেখিয়া থার্ড ক্লাসের সামনে গিয়া দাঁড়াইতেই আগন্তুকদের মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠিল। তৃতীয় বেঞ্চে কপিলদেও বসিয়াছিল। লোকটা বলিল, "চৌধুরীজী, একবার উঠি তো।"

কপিলদেও বেঞ্চের উপরও প্রায় চারফুট আরও বেশি হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, তাহার পর দীর্ঘ নগ্ন পা ফেলিয়া ফেলিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

ইন্‌স্‌পেক্‌টার সাহেব একদৃষ্টে চাহিয়া চুরুট টানিতে লাগিলেন। লোকটা কাগজের মোড়ক ধীরে ধীরে খুলিয়া একজোড়া বিরাট জুতা

সামনে রাখিয়া মিষ্ট কণ্ঠে বলিল, "খালি পাঁও কাহে, চৌধুরীজী? লি, পেন্‌হি আপনা জুতা।" অর্থাৎ খালি পায়ে কেন? নাও, পরো নিজের জুতো।

হাত দুইটা ঝাড়িয়া সাহেবের পানে চাহিল।

আমরা কপিলদেওকে হারাইলাম। হুকুম হইল স্কুলের সাধারণ ছেলের সঙ্গে শক্তিগত যার এতটা বৈষম্য তাহাকে স্কুল হইতে সরাইতে হইবে। ক্লাসের রেকর্ড দেখিয়াও যখন বোঝা যায় এ পড়িবার ছেলে নয়, অন্য কিছুর জন্য পোষা।

পরের মাসে খবর পাওয়া গেল ইন্‌স্‌পেক্টারের বিশেষ সুপারিশে কপিলদেওয়ের দারোগা পদে নিয়োগ হইয়াছে।

[পাঞ্চজন্য, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৪৬]